শ্রীকুলদা প্রসাদ চৌধুরী

ছেলে মানুষ করা



বুক সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিঃ

অহেতুক ভয়, মিথ্যা কথা বলা, চুরি করা ইত্যাদি অনভিপ্রেত ব্যবহার একের পর একটি ছেলের মধ্যে দেখা দিতে থাকে। যে ছেলে একদিন ছিল জীবনের আনন্দ-উৎস, সে-ই জীবনের সবচেয়ে বড় অশান্তি হয়ে ওঠে! কেন এমন হয়? কি করে ছেলেমেয়েদের মানুষ করা যায়—এই প্রশ্নই মা-বাবার মনে বার বার জেগে ওঠে। আধুনিক বিজ্ঞান কি তাঁদের এই প্রশ্নের কোন জবাব দিতে পারে?

সন্তান মানুষ করার চেষ্টায় মা-বাবার কোন অবহেলা নেই। এই সেদিনও এক বন্ধুপত্নী বলছিলেন, "জীবনে আর কিছু চাই না। ছেলেমেয়েগুলো মানুষ হলেই হল।" কিন্তু এ বিষয়ে উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান না থাকার ফলে, পিতামাতার ভুলের জন্যই অনেক সময় ছেলেদের মধ্যে অবাঞ্ছিত ব্যবহার দেখা দেয়। পাঁচ মাস বয়সের ছেলে, বার বার নিজের হাত মুখে পুরে চুষ্‌তে চেষ্টা করছে। ছেলের স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কায় মা হয়তো বার বারই হাতখানা সরিয়ে দিচ্ছেন। তিনি কিন্তু কল্পনাও করতে পারেন না, তাঁর এই সস্নেহ সাবধানতা ছেলের মানসিক স্বাস্থ্যের কতখানি ক্ষতি করতে পারে। আরেকদিন পাশের ঘর থেকে কানে আসছিল, একজন ভদ্রমহিলা গর্বভরে তাঁর বন্ধুর কাছে বলছেন, "আমার মেয়ের, ভাই, ১১ মাস বয়সেই বিছানায় পেচ্ছাব করার অভ্যাস ছাড়িয়ে দিই। অবশ্য কষ্ট একটু পেতে হয়েছিল!" কষ্ট করে তিনি যে অসাধ্য সাধন করলেন তা যে তাঁর মেয়ের ভবিষ্যৎ জীবনের ওপর কতখানি মন্দ প্রভাব বিস্তার করতে পারে সে সম্বন্ধে তিনি

মোটেই অবহিত নন। আধুনিক শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান সন্তান মানুষ করা সম্বন্ধে খানিকটা জ্ঞান সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়েছে। সে বিষয়ে কিছুটা জানা থাকলে সন্তান মানুষ করায় মা-বাবার যে অনেকটা সাহায্য হয় তা'তে সন্দেহ নেই।

আধুনিক বিজ্ঞান সর্বপ্রথম-"দুষ্টু ছেলেদের" সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করতে বলে। "দুষ্টু ছেলেরা" সত্যি সত্যি দুষ্টু নয়। আনন্দ পায় বলেই যে ছেলেরা মা-বাবার অনভিপ্রেত ব্যবহারে লিপ্ত হয় তা নয়। জ্বর যেমন কেউ ইচ্ছে করে করে না—তেমনি কোন ছেলে ইচ্ছে করে বদ্‌রাগী বা ভীতু হয় না। পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে, ঘটনা পরম্পরার সংঘাতে ছেলেদের মধ্যে অনভিপ্রেত ব্যবহার দেখা দেয়। পিতামাতার মত ছেলেমেয়েরাও এ বিষয়ে অনেকটা নিরুপায়। নিজেদের ব্যবহারের জন্য ভিতরে ভিতরে তাদের যথেষ্ট অপরাধবোধ থাকে। যে সব ছেলেদের মধ্যে অনভিপ্রেত ব্যবহার দেখা দেয়, তাদের কারো মনে যে শান্তি থাকে না তা হলপ্ করে বলা চলে। জ্বর হলে কি কারো শরীরে শান্তি থাকতে পারে? "দুষ্টুমি" দূর করতে গিয়ে শাস্তির ব্যবস্থা করলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কুফল দেখা দেয়। এ যেন জলে চুবিয়ে জ্বরের রোগীর শরীরের তাপ দূর করা। অতি অল্প সময়ের জন্য শরীর ঠাণ্ডা হলেও পরিণামে তাপ বৃদ্ধি হওয়া অনিবার্য। রোগের জটিলতাও আরও অনেক বেড়ে যাবে নিঃসন্দেহে। শাস্তি না দেওয়ার অর্থ ছেলে যা করছে তাতেই সায় দেওয়া নয়—তার অনভিপ্রেত ব্যবহার দূর করার চেষ্টা ছেড়ে দেওয়া নয়। "কার্য-কারণ জেনে

ছেলে মানুষ করা

প্রথম পর্ব

ভয় ও মিথ্যা কথা—কেন ?

শ্রীকুলদাপ্রসাদ চৌধুরী, এম্. এ. (লণ্ডন)

ডেভিড্ হেয়ার ট্রেনিং কলেজের শিক্ষা ও মনস্তত্ত্বমূলক
গবেষণাগারের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক। বিশ্বভারতী,
বিনয় ভবনের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ

বুক সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড

৬ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট্ কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮

মূল্য—১·২৫ ন. প.

৬নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯, বুক সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষ হইতে
শ্রীপরেশচন্দ্র ভাওয়াল কর্তৃক প্রকাশিত ও ৩১, বাদুড় বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯,
রূপবাণী প্রেসের পক্ষে শ্রীভোলানাথ হাজরা কর্তৃক মুদ্রিত

ভূমিকা

মেয়েরা কোন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে "নিউ এম্পায়ার্" মঞ্চে নৃত্যে অংশ গ্রহণ করবে। এদিকে চার মাসের 'বাপন্।' মেয়েদের নাচ দেখবার লোভ মা-বাবা দুজনেরই প্রচুর। ভ্রাতা এবং ভ্রাতৃবধূ দুজনে স্বেচ্ছায় প্রস্তাব করলে ছেলেকে ওরা অনায়াসে রাখতে পারবে। খানিকটা ইতস্ততঃ করে রাজী হলাম—ভাব্লাম, শিশুটির অভাব অভিযোগ হয়তো এখনও জৈবস্তর ছাড়িয়ে যায়নি এবং তার যা-কিছু প্রয়োজন ভ্রাতৃবধূ অনায়াসেই মেটাতে পারবে। সবশুদ্ধ দুই ঘণ্টা অনুপস্থিত ছিলাম। ফিরে এসে সিঁড়ির গোড়া থেকেই কান্নার আওয়াজ কানে গেল। শুনলাম আমরা ঘুম পাড়িয়ে রেখে যাওয়ার আধঘণ্টার মধ্যেই বাপন্ জেগে গিয়েছিল। তারপর আর কোল ছাড়া হয়নি। সেই থেকে কান্নার বিরাম ছিল না। কখনও আস্তে কান্না কখনও বা জোরে চীৎকার।

তারপর আরও একমাস কেটে গেছে। আজও 'বাপন্' কোন আচেনা লোকের কোলে তো যায়ই না বরং অচেনা মুখ দেখলেই কাঁদতে সুরু করে। আমার ভ্রাতা এবং ভ্রাতৃবধূও আজ পর্যন্ত ওর কাছে যেন অপরিচিত। ওদের দেখলেই কান্না জুড়বে। শুধু তাই নয়, এই ঘটনার পর প্রায় এক সপ্তাহ ছেলের ভাল ঘুম হোত না। অতি সামান্য আওয়াজেই ওর ঘুম ভেঙ্গে যেত এবং সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার সুরু হোত।

'বাপনে'র ভবিষ্যৎ জীবনকে এই রূঢ় অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়া থেকে রক্ষা করতে পারব তো ?

'ছেলে মানুষ করার' সূচনা এই ঘটনা থেকে। ইচ্ছা আছে ছোট ছোট বই-এ ছেলেমেয়েদের সব কয়টি 'ব্যবহার সমস্যা' সম্বন্ধেই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আলোচনা কোরব।

'ছেলে মানুষ করার' নিয়ম না জানা থাকার জন্যে, আমরা মা-বাবারা, অনেক সময় শিশুজীবনের গুরুতর ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াই। 'ছেলে মানুষ করা' কোন মা-বাবার সামান্য কাজে লাগ্‌লেও শ্রম সার্থক মনে কোরব।

শিক্ষকগণ 'ছেলে মানুষ করার' কাজে মা-বাবার সহকর্মী। ছাত্রদের ব্যবহারের কার্যকারণ সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি না থাক্‌লে, তাঁদের পক্ষে শিক্ষা কার্যে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। আশা করি বইখানা শিক্ষকদেরও কাজে লাগ্‌বে। ইতি—

গ্রন্থকার

আশীর্বাদ

মেয়ে মমতা স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়ে, অবসর আছে। সে-ই বইখানা নকল করে দিয়েছে এবং স্থানে স্থানে ভাষারও সংশোধন করেছে। তাকে আশীর্বাদ করি।

বাবা

ছেলে "মানুষ করায়" বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী

"ওগো, দেখ দেখ, বাপন্ তোমার দিকে চেয়ে কেমন হাসছে", স্ত্রী স্বামীকে ডেকে দেখাচ্ছেন। সন্তান! মা-বাবার আদরের ধন, জীবনের আনন্দ—স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রেমের সেতু। স্ত্রী আবার বলছেন, "দুষ্টুটা পেটে পেটে এখনই যা বুদ্ধি রাখে—সব বোঝে"। সন্তান-গর্বে মা-বাবা দুজনেরই বুক ভরে ওঠে। ছেলে বড় হতে থাকে। সে হাসতে শেখে, কথা বলতে শেখে—বসতে পারে, দাঁড়াতে পারে। প্রায় প্রতিদিনই তার মধ্যে নূতন নূতন লীলা খেলা দেখা দেয়।

মা-বাবা আনন্দে আত্মহারা—ভাবেন তাঁদের ছেলের মত এমন ছেলে আর হয় না। সে যে অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী তাতে দুজনের কারোও সন্দেহ থাকে না। আশায় আকাংক্ষায় তাঁরা কত কল্পনার স্বর্গ তৈরী করেন।

তারপর, ছেলের ৬।৭ বছর বয়স থেকে শুরু হয় ভুল ভাঙ্গার পালা। এই মাকেই বলতে শোনা যায়, "ওগো, বাপন্ যে পড়াশুনো একেবারেই করতে চায় না!".

"ছি ছি, এমন ছেলেই পেটে ধরেছিলাম, স্কুল থেকে কোন ছেলের স্কেল্ চুরি করে নিয়ে এসেছে। ছি ছি, লজ্জায় আর মুখ দেখানো যায় না।" অমনোযোগ, অবাধ্যতা, ঈর্ষা,

অহেতুক ভয়, মিথ্যা কথা বলা, চুরি করা ইত্যাদি অনভিপ্রেত ব্যবহার একের পর একটি ছেলের মধ্যে দেখা দিতে থাকে। যে ছেলে একদিন ছিল জীবনের আনন্দ-উৎস, সে-ই জীবনের সবচেয়ে বড় অশান্তি হয়ে ওঠে! কেন এমন হয়? কি করে ছেলেমেয়েদের মানুষ করা যায়—এই প্রশ্নই মা-বাবার মনে বার বার জেগে ওঠে। আধুনিক বিজ্ঞান কি তাঁদের এই প্রশ্নের কোন জবাব দিতে পারে?

সন্তান মানুষ করার চেষ্টায় মা-বাবার কোন অবহেলা নেই। এই সেদিনও এক বন্ধুপত্নী বলছিলেন, "জীবনে আর কিছু চাই না। ছেলেমেয়েগুলো মানুষ হলেই হল।" কিন্তু এ বিষয়ে উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান না থাকার ফলে, পিতামাতার ভুলের জন্যই অনেক সময় ছেলেদের মধ্যে অবাঞ্ছিত ব্যবহার দেখা দেয়। পাঁচ মাস বয়সের ছেলে, বার বার নিজের হাত মুখে পুরে চুষ্‌তে চেষ্টা করছে। ছেলের স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কায় মা হয়তো বার বারই হাতখানা সরিয়ে দিচ্ছেন। তিনি কিন্তু কল্পনাও করতে পারেন না, তাঁর এই সস্নেহ সাবধানতা ছেলের মানসিক স্বাস্থ্যের কতখানি ক্ষতি করতে পারে। আরেকদিন পাশের ঘর থেকে কানে আসছিল, একজন ভদ্রমহিলা গর্বভরে তাঁর বন্ধুর কাছে বলছেন, "আমার মেয়ের, ভাই, ১১ মাস বয়সেই বিছানায় পেচ্ছাব করার অভ্যাস ছাড়িয়ে দিই। অবশ্য কষ্ট একটু পেতে হয়েছিল!" কষ্ট করে তিনি যে অসাধ্য সাধন করলেন তা যে তাঁর মেয়ের ভবিষ্যৎ জীবনের ওপর কতখানি মন্দ প্রভাব বিস্তার করতে পারে সে সম্বন্ধে তিনি

মোটেই অবহিত নন। আধুনিক শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান সন্তান মানুষ করা সম্বন্ধে খানিকটা জ্ঞান সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়েছে। সে বিষয়ে কিছুটা জানা থাকলে সন্তান মানুষ করায় মা-বাবার যে অনেকটা সাহায্য হয় তা'তে সন্দেহ নেই।

আধুনিক বিজ্ঞান সর্বপ্রথম "দুষ্টু ছেলেদের" সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করতে বলে। "দুষ্টু ছেলেরা" সত্যি সত্যি দুষ্টু নয়। আনন্দ পায় বলেই যে ছেলেরা মা-বাবার অনভিপ্রেত ব্যবহারে লিপ্ত হয় তা নয়। জ্বর যেমন কেউ ইচ্ছে করে করে না—তেমনি কোন ছেলে ইচ্ছে করে বদ্‌রাগী বা ভীতু হয় না। পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে, ঘটনা পরম্পরার সংঘাতে ছেলেদের মধ্যে অনভিপ্রেত ব্যবহার দেখা দেয়। পিতামাতার মত ছেলেমেয়েরাও এ বিষয়ে অনেকটা নিরুপায়। নিজেদের ব্যবহারের জন্য ভিতরে ভিতরে তাদের যথেষ্ট অপরাধবোধ থাকে। যে সব ছেলেদের মধ্যে অনভিপ্রেত ব্যবহার দেখা দেয়, তাদের কারো মনে যে শান্তি থাকে না তা হলপ্ করে বলা চলে। জ্বর হলে কি কারো শরীরে শান্তি থাকতে পারে? "দুষ্টুমি" দূর করতে গিয়ে শাস্তির ব্যবস্থা করলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কুফল দেখা দেয়। এ যেন জলে চুবিয়ে জ্বরের রোগীর শরীরের তাপ দূর করা। অতি অল্প সময়ের জন্য শরীর ঠাণ্ডা হলেও পরিণামে তাপ বৃদ্ধি হওয়া অনিবার্য। রোগের জটিলতাও আরও অনেক বেড়ে যাবে নিঃসন্দেহে। শাস্তি না দেওয়ার অর্থ ছেলে যা করছে তাতেই সায় দেওয়া নয়—তার অনভিপ্রেত ব্যবহার দূর করার চেষ্টা ছেড়ে দেওয়া নয়। "কার্য-কারণ জেনে

উপযুক্ত ব্যবহার কর”—এই-ই আধুনিক বিজ্ঞানের অভিমত। কোন ছেলেই অনভিপ্রেত ব্যবহারের “বীজাণু” নিয়ে জন্মায় না। যে কারণের জন্য তার মধ্যে অনভিপ্রেত ব্যবহার করার প্রবণতা জন্মেছে, তা জেনে উপযুক্ত প্রতিকারের ব্যবস্থা করলেই শুধু ঐ ব্যবহার দূর হতে পারে। গল্প শুনেছিলাম এক হাতুড়ে বৈদ্য সকলকেই জোলাপের ব্যবস্থা দিতেন। একদিন উদরাময়ে আক্রান্ত এক রোগীকেও একই ব্যবস্থা দিলেন। ফলে রোগীর মৃত্যু হল। অনভিপ্রেত ব্যবহার দূর করার জন্য শাস্তি দেওয়াও অনেকটা জোলাপের ব্যবস্থার মত। অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়লে অথবা ‘সব রোগের এক দাওয়াই’ ব্যবস্থা করলে হিতে বিপরীত ফল হওয়াই সম্ভব। কার্য-কারণ জেনে তবে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

অবাঞ্ছিত ব্যবহার মানসিক ব্যাধি

ফ্রয়েড্ সাহেব অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে সর্বপ্রথম আমাদের বোঝাতে চেষ্টা করেন যে অনভিপ্রেত ব্যবহার “মানসিক অস্বাস্থ্যের লক্ষণ”। শরীরে স্বাস্থ্যহানি ঘটলে তা যেমন প্রকাশ পায় জ্বর মাথাব্যথা পেটকামড়ানো ইত্যাদিতে, তেমনি মনের স্বাস্থ্যহীনতা প্রকাশ পায় অমনোযোগ, ঈর্ষা, অহেতুক ভয়, চুরি করা, মিথ্যা কথা বলা ইত্যাদি অনভিপ্রেত ব্যবহারের ভেতর দিয়ে। এই ধরণের ব্যবহার মানসিক রোগের লক্ষণ। বর্তমান সভ্যতা এবং জীবনধারা শারীরিক ও মানসিক কোন স্বাস্থ্যেরই অনুকূল নয়।

শারীরিক রোগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার ধারার প্রভূত পরিবর্তন ঘটেছে। তা ছাড়া স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আজকাল আমরা অনেকটা সচেতন হয়ে উঠেছি। কিন্তু মানসিক রোগ বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও এ সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা এতটুকু কমেনি। তাই আজকাল ছেলেমেয়ে "মানুষ করা" আমাদের কাছে এত কঠিন মনে হয়। আমরা নিজেরাই মানসিক ব্যাধিতে জর্জরিত, আর আমাদের সন্তানদের মধ্যে তা প্রায় আয়ত্তের বাইরেই চলে যাচ্ছে। অসহায়ভাবে এই অবস্থার জন্য আমরা একে অন্যের উপর দোষ চাপিয়ে নিজেদের মনের অপরাধ লাঘবের চেষ্টা করছি।

মানসিক ব্যাধি সম্বন্ধে আর একটি কথা মনে রাখতে হয়। এ অনেকটা পুরানো (ক্রনিক্) রোগের মত। শুরুতেই খুব যে একটা বাড়াবাড়ি হয়ে অকেজো করে ফেলবে তা নয়। প্রথম প্রথম শুধু একটু কেমন কেমন ভাব—সামান্য একটু অশান্তি। কিন্তু ধীরে ধীরে বেড়ে যখন চরমে পৌঁছোবে তখন আর বাগ্ মানানো সহজ নয়। আবার প্রথমেই রোগ ধরে প্রতিকারের চেষ্টা করলে সহজেই ছেড়ে যায়। মা-বাবার মানসিক স্বাস্থ্যতত্ত্ব কিছুটা জানা থাকলে, গোড়াতেই অনেক অনভিপ্রেত ব্যবহারের প্রতিকার হতে পারে।

ফ্রয়েড্ সাহেবের কারণ নির্ণয়

ফ্রয়েড্ সাহেবের নির্দেশিত মানসিক অস্বাস্থ্যের কারণ নিয়েই আমরা আলোচনা আরম্ভ করি: মনস্তত্ত্ববিদ্ ফ্রয়েড্

মানুষের মনকে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করেছেন। যেমন, চেতন এবং অবচেতন। অবচেতন মনে কি হচ্ছে তা আমরা চেষ্টা করেও জানতে পারি না। চেতন মনের আশা-আকাংক্ষা ও প্রেরণার তাগিদেই আমরা কাজে ব্রতী হই। কেন কোন কাজে লিপ্ত হলাম তার উত্তর আমরা চেতন মনেই হাত্‌ড়ে বেড়াই। সব সময় তার জবাব পাই কি? অনেক সময় আমরা চেতন মনের আশা-আকাংক্ষার উল্টো কাজ করে বসি—যা করা উচিত মনে করি তা করে উঠতে পারি না, মনে অনুশোচনা হয়। যেমন, ধরা যাক্—অফিসের চেয়ারে বসে বসে দিবাস্বপ্ন দেখছি। অথচ জরুরী ফাইল পড়ে আছে টেবিলে। একদিন নয়, একবার নয়, নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বার বার এমন ঘটতে থাকে। একজন কৃপণ নাকি প্রচুর অর্থ থাকা সত্ত্বেও তার একমাত্র ছেলেটিকে বিনা চিকিৎসায় মরতে দিয়েছিল। এই সব সমস্যার প্রকৃত কারণ জানতে হলে ডুব দিতে হবে অবচেতন মনে। কোন কাজই কারণহীন নয়। ফ্রয়েড্-এর মতে অবচেতন মনের দ্বন্দ্ব থেকেই যত অনভিপ্রেত ব্যবহারের সৃষ্টি। সেখানে নাকি সব সময় দেবাসুরের সংগ্রাম চল্‌ছে এবং তা থেকেই যত অনর্থ। আমাদের জন্মগত প্রবৃত্তিগুলির বাস অবচেতন মনে। তারাই আমাদের সকল কাজের আদি প্রেরণা। এই প্রবৃত্তিগুলি আত্মকেন্দ্রিক—আত্মতৃপ্তিই এদের একমাত্র কাম্য। আদিম প্রবৃত্তিগুলি আত্মকেন্দ্রিক হলেও, মানুষের বাস সমাজের দশজনকে নিয়ে। সামাজিক পটভূমি ব্যতীত কোন প্রবৃত্তিরই নিবৃত্তি হতে পারে না। একমাত্র পারিপার্শ্বিকই প্রবৃত্তিগুলির

তৃপ্তি সাধনে সক্ষম। তাই প্রবৃত্তিগুলিকে ছুটতে হয় চেতন-মনের দিকে। চেতন মন সামাজিক আইন-কানুনের দ্বারা প্রভাবান্বিত। একটি আত্মকেন্দ্রিক ও অপরটি সামাজিক হওয়ার ফলে, আদিম প্রবৃত্তি ও সামাজিক রীতিনীতির মধ্যে সর্বক্ষণ দ্বন্দ্ব অনিবার্য। ধরুন—যথেচ্ছ যৌন-সম্ভোগের আদিম প্রবৃত্তি চেতন মনের সামাজিক বোধের কাছে আঘাত পাবেই এবং ফলে দ্বন্দ্বেরও সৃষ্টি হবে। চেতন ও অবচেতন মনের এই দ্বন্দ্বও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংঘটিত হয় আমাদের অজ্ঞাতে। কি কারণে আমাদের মনে দ্বন্দ্ব চলছে সে সম্বন্ধে আমাদের কোন স্পষ্ট ধারণা থাকে না। দ্বন্দ্বের ফল ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। এই ব্যবহারের কার্য-কারণও আমাদের বুদ্ধির অগম্য থাকে। সাধারণতঃ মানসিক দ্বন্দ্ব থেকে চার রকম ব্যবহার প্রকাশ পেতে পারে।

সরল ব্যবহার ঃ যেখানে নীতিবোধ খুব প্রবল নয়, মানসিক দ্বন্দ্বে আদিম প্রবৃত্তির সেখানে জয়লাভের সম্ভাবনা —চেতন মন তাকেই নিজের আকাংক্ষারূপে গ্রহণ করে—তার নিবৃত্তির চেষ্টা করে। ধরা যাক, আমাদের সবকিছু নিজের জন্য সংগ্রহ করার প্রবৃত্তিকে (Acquisitive Instinct)। যে ছেলে চোরের পরিবারে মানুষ হয়েছে, তার এই প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে নীতিবোধ যথেষ্ট জাগ্রত হওয়ার কথা নয়। ফলে আদিম প্রবৃত্তিকে চেতন মন হয়তো সহজেই গ্রহণ করে নেবে এবং সুযোগ পেলেই ছেলেটি চুরি করতে দ্বিধা করবে না। শুধু শাস্তির ভয়ে গোপনতা অবলম্বন করবে। চুরি করার জন্য

তার নিজের মনে বিশেষ কোন অপরাধ বোধই থাকবে না। এসব ক্ষেত্রে ব্যবহারের কার্য-কারণ নির্ণয়ও সহজ, প্রতিকারও সহজ। ছেলেটির যেসব প্রয়োজন বোধ জন্মেছে তার নিবৃত্তি এবং নীতিবোধ ভালভাবে জাগিয়ে তুলতে পারলেই চুরি করার অভ্যাস দূর হবে বলে আশা করা যায়।

নিষ্পেষণ জনিত ব্যবহার ঃ সামাজিক নীতিবোধ যেখানে খুব প্রবল, কিন্তু আদিম প্রবৃত্তি দুর্দমনীয় নয়, সে স্থলে নীতিবোধের চাপে প্রবণতাকে অবচেতন মনের আরও গভীরে ঠেলে দিয়ে মানসিক দ্বন্দ্বের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এই দ্বন্দ্বের অবসান মাত্র সাময়িক ভাবেই হয়। যখনই কোন সুযোগে আদিম প্রবৃত্তি অধিকতর বল সংগ্রহ করতে পারে তখনই দ্বন্দ্ব আবার প্রবল হয়ে ওঠে— এত প্রবল হয় যে, মনের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয় এবং নানারূপ বিকার দেখা যায়।

একটি ১৩ বছরের ছেলে, হঠাৎ একদিন মাঝরাত্রে ভয়ের স্বপ্ন দেখে চীৎকার করে উঠল। তারপর কয়েক রাত তার বিছানায় যেতেই ভয় করতে লাগল। ঘুমোনোর সময় মাকে সঙ্গে যেতে হোত এবং ছেলে না ঘুমোনো পর্যন্ত তাঁকে বসে থাকতে হোত। তবু একটু পরপরই ভয় পেয়ে ছেলেটি জেগে উঠত। ৩।৪ দিন পরে অবশ্য এই অবস্থা চলে গেল। কিন্তু ২।৩ মাস অন্তর ছেলেটি এই রকম ভয় পেতে লাগল। অনু-সন্ধানে জানা গেল ৪।৫ বছর বয়সে ছেলেটির আত্মরমণের (Masturbation) চেষ্টা হঠাৎ এক রাত্রে মায়ের চোখে ধরা

পড়ে। ছেলেটির ভবিষ্যৎ দুশ্চরিত্রতার আশংকায় মা-বাবা অত্যন্ত চিন্তান্বিত হয়ে পড়েন। বাবা মা তাকে নানাভাবে ভয় দেখালেন। রাত্রে তাঁরা খুব সজাগ থাক্‌তে লাগ্‌লেন এবং যখনই ছেলেকে আত্মরমণের চেষ্টা করতে দেখলেন তখনই জাগিয়ে দিয়ে শাসন করতে লাগলেন। কয়েকদিন রাগের বশবর্তী হয়ে খুব প্রহারও করলেন। ধীরে ধীরে ছেলেটির এই অভ্যাস চলে গেল—আদিম প্রবৃত্তিকে মনের আরও গভীরে ঠেলে দেওয়া হল। মা-বাবা নিশ্চিন্ত হলেন। কিন্তু কৈশোরে পুনরায় যৌনবোধ জাগ্রত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাল্যের নিষ্পেষিত প্রবণতা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চেষ্টা করল। বাধা না পেলে, যেমন স্বাভাবিক নিয়মে বাল্যের সেই আত্ম-রমণের ব্যবহার প্রকাশ পেয়েছিল, তেমনি স্বাভাবিক নিয়মে তা চলেও যেত—অন্ততঃ শারীরিক বা মানসিক কোন ক্ষতি এ থেকে হোত না। কিন্তু মাতাপিতার অবিবেচনায় নিষ্পেষিত হওয়ার ফলে, অনুকূল আবহাওয়া পেয়ে দ্বিগুণ শক্তিতে এই প্রবণতা প্রকাশের সুযোগ খুঁজতে লাগল। অবচেতন মনের সংগ্রাম অত্যন্ত বৃদ্ধি পেল এবং রাত্রে শুতে যাওয়া সম্বন্ধে অহেতুক ভয়ে তার প্রকাশ হল। ছেলেটির অবচেতন মনের আশংকা, কি জানি আবার যদি আত্মরমণের অভ্যাস দেখা দেয়। ভয়ের প্রকৃত কারণ ঠিক করে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন না করতে পারলে মানসিক দ্বন্দ্বের জটিলতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে পেতে একদিন ছেলেটি হয়ত স্বাভাবিক জীবনধারণে একেবারে অনুপযুক্ত হয়ে যাবে।

ছদ্মবেশী ব্যবহার ঃ নীতিবোধ এবং প্রবৃত্তি, উভয়ের শক্তিই যখন প্রায় সমান সমান, স্বাভাবিক তৃপ্তির পথ বন্ধ দেখে, প্রবণতা অনেক সময় বিকল্প তৃপ্তি লাভের চেষ্টা করে। আমাদের অধিকাংশ ব্যবহারের মূলেই আছে এই বিকল্প তৃপ্তির চেষ্টা।

নয় বছরের একটি ছেলে পড়াশুনায় ক্রমেই অমনোযোগী হয়ে পড়ছিল। সব সময় ক্লাশের পেছনের বেঞ্চে বসে থাকত। কারও সঙ্গে কথাও বলত না অথচ জিজ্ঞেস করলে ক্লাশে কি পড়া হচ্ছে কিছুই বলতে পারত না। বাড়ীতে বই নিয়ে বসে থাকতো বটে কিন্তু পড়া কিছুই এগুতো না। খেলাধূলায়ও ছেলেটির মন ছিল না। বন্ধুবান্ধবও তার কেউ ছিল না, কারো সঙ্গে সে মিশতে চাইত না। অনুসন্ধানে ধরা পড়ল ছেলেটি "দিবাস্বপ্ন" দেখত। কোনদিক দিয়ে আত্ম-প্রকাশের সুযোগ সে পাচ্ছিল না। বাবা মা দুজনই ছিলেন অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী। একমাত্র ছেলে—তার সম্বন্ধে তাঁদের আশা আকাংক্ষার সীমা ছিল না। অতি অল্প বয়স থেকেই তার শিক্ষাচর্চা আরম্ভ হয়েছিল। সাত বছরে পা দিতে না দিতেই ছেলেটিকে শহরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্কুলে, ক্লাশ থ্রী-তে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। ছেলেটির বুদ্ধি ছিল কিন্তু সাধারণ স্তরের। সব সময়ই তাকে নিজের সাধ্যের অতীত কাজের সম্মুখীন হওয়ার জন্য আত্মবিশ্বাস তার একেবারে ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়েছিল। উচ্চাকাংক্ষার চাপে এবং অতিরিক্ত তাড়নায় সমবয়সীদের সঙ্গে বয়সোচিত খেলাধূলায় আত্মপ্রকাশের সুযোগ সে পায়নি। ফলে সে বিকল্প তৃপ্তিলাভের জন্য নিজেরই অজান্তে দিবাস্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছিল।

বাস্তবজীবনে যে সব আশা আকাংক্ষার তৃপ্তির কোন উপায় ছিল না, স্বপ্নের সাহায্যে সে সেইসব আশা আকাংক্ষার তৃপ্তি খুঁজে বেড়াত। ক্লাশে পড়া হচ্ছে কিন্তু ছেলেটি হয়তো দিবাস্বপ্ন দেখছে যে পুরস্কার বিতরণী সভায় সে প্রথম পুরস্কার পাচ্ছে।

মানসিক বিকৃতিজনিত ব্যবহার: সামাজিক নীতিবোধ এবং প্রবৃত্তির দাবী উভয়ই যখন অত্যন্ত প্রবল, বিকল্প ব্যবস্থা তখন তৃপ্তি আনতে পারে না। মানসিক দ্বন্দ্ব এমন চরমে পৌঁছোয় যে সমগ্র মনকে বিকল করে দেয়। ফলে গুরুতর শারীরিক বা মানসিক রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

একটি ১৭ বছর বয়সের মেয়ে আই. এস-সি. পরীক্ষা দিতে বসে দেখল যে সে প্রশ্নপত্র ভাল করে দেখতে পাচ্ছে না। পরীক্ষা দেওয়া আর তার হোল না। হঠাৎ সে প্রায় অন্ধ হয়ে পড়ল। এর আগে কিন্তু তার কখনও চোখের কোন দোষ ছিল না। ডাক্তাররা অনেক পরীক্ষা করেও তার এই আকস্মিক অন্ধত্বের কারণ নির্ধারণ করতে পারলেন না। কোনরূপ চিকিৎসা দ্বারাই তার দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পেল না।

অনুসন্ধানে প্রকাশ পেল যে মেয়েটি স্কুল ফাইন্যালে বৃত্তি নিয়ে কলেজে ঢুকেছিল। খুবই শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে। পারিবারিক নীতিবোধ, আশা আকাংক্ষা খুব উঁচু তারে বাঁধা। কলেজে ঢুকে সর্বপ্রথম সে অনেকখানি স্বাধীনতা পায় এবং অত্যন্ত সাধারণ ঘরের একটি ছেলের সঙ্গে প্রেমে পড়ে। মেয়েটি কারও কাছে এই কথাটা প্রকাশও করতে পারত না, এমন কি নিজের কাছে স্বীকার করতেও লজ্জা হোত। কিন্তু এই প্রেম যেন তাকে

ঘাড়ে ধরে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অবাঞ্ছিত পথে নিয়ে যাচ্ছিল। সর্বদা মানসিক দ্বন্দ্বের দরুণ তার পড়াশুনাও কিছু হচ্ছিল না। তাই পরীক্ষায় বসে মেয়েটি দেখে যে সে প্রায় কিছুই উত্তর করতে পারছে না। দুবছর আগে তার দিদির পরীক্ষার সময় জলবসন্ত হওয়ায় পরীক্ষা দিতে পারে নি। তাতে সে নিন্দার পরিবর্তে সকলের কাছ থেকে প্রচুর সহানুভূতি পেয়েছিল। পরীক্ষার হলে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পড়ে মেয়েটির অবচেতন মনে জেগেছিল তীব্র আকাংক্ষা, "আমার যদি অসুখ হোত, এই প্রশ্নপত্র যদি আমাকে দেখতে না হোত"। রহস্যপূর্ণ মানুষের মন। ঠিক কি ভাবে কি ঘটেছিল বলা শক্ত, কিন্তু মেয়েটি আংশিক অন্ধ হয়ে গেল তা সত্য এবং অবচেতন মনের প্রবল ইচ্ছার ফলে অনুরূপ মানসিক অবস্থায় অন্ধতা, পেটের অসুখ ইত্যাদি অনেক রোগই হতে পারে তাতে সন্দেহ নেই।

অবাঞ্ছিত ব্যবহার সম্বন্ধে অধুনাতম দৃষ্টিভঙ্গি

অবাঞ্ছিত ব্যবহার যে ইচ্ছাকৃত নয়, উপরের আলোচনা এবং দৃষ্টান্ত থেকে তা বোঝা যাবে। কেন কি কাজ করছি, আমরা নিজেরাও তা বুঝতে পারি না। অনেক সময় নিজের মনে লজ্জা ও গ্লানি সত্ত্বেও অনেকটা যেন বাধ্যতামূলকভাবে কাজ করে যাই। আপাতদৃষ্টিতে যাকে আমাদের ব্যবহারের কারণ বলে মনে হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা কিন্তু প্রকৃত কারণ নয়। ঐ কারণকে অনুসরণ করে প্রতিকার ব্যবস্থা করে গেলে অনেক ক্ষেত্রেই হিতে বিপরীত ফল হয়।

বর্তমানে অনেক মনস্তাত্ত্বিক ফ্রয়েড সাহেবের মতবাদ সম্পূর্ণ গ্রহণ করেন না। মানুষের বিবেক ও প্রবৃত্তির মধ্যে সংগ্রাম, অন্তরের মধ্যে সৎ অসতের দ্বন্দ্ব, দেবাসুরের যুদ্ধ, এসব আমাদের কাছে কিছু নূতন কথা নয়। আমাদের পুরাণে নানাভাবে, নানা গল্পচ্ছলে এই ধারণার কথা প্রকাশ করা হয়েছে। আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতাও এই ধারণার পরিপোষক। সত্যিই তো যতসব অপকর্ম করতে আমাদের প্রবৃত্তি! সব সময়ই অপকর্ম করে অপরাধবোধে মন ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে। কিন্তু সত্যিই কি আমরা পাপপ্রবৃত্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করি? আমরা কি অসুর প্রকৃতির? আমরা ভগবানের অংশ বা ভগবানের সন্তান হলে তা কি করে সম্ভব? আধুনিক মনস্তত্ত্ব মানুষের জন্মগত কোন প্রবৃত্তিকে মন্দ বলে স্বীকার করে না। বিবেক ও প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব আসে মানুষ ও সমাজের বিকাশের বিকৃতি থেকে। জন্মগত প্রবৃত্তি ও পরিবেশ একযোগে কাজ করে মানুষকে গড়ে তোলে —তার প্রবণতা, আশা আকাংক্ষার সৃষ্টি করে। এ কাজে এদের প্রভাব পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিচার করা সম্ভব নয়। পরিবেশ একদিকে জন্মগত প্রবৃত্তির উপর প্রভাব বিস্তার করে যেমন আশা আকাংক্ষা ও প্রবণতার সৃষ্টি করে, অপরদিকে তাকেই আবার তাদের নিবৃত্তিরও ব্যবস্থা করতে হয়। আশা আকাংক্ষা ও প্রবণতার সৃষ্টি এবং তাদের নিবৃত্তির পথে সামঞ্জস্য থাকলেই আর কোন গোলমাল হয় না। কিন্তু তাদের নিবৃত্তি পরিবেশের দ্বারা ব্যাহত হলেই মানসিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় এবং দ্বন্দ্ব প্রকাশ পায় বিকৃত ব্যবহারে। একবার ব্যবহারের বিকৃতি ঘটলে তা

পরিবেশের দ্বারা আরও বেশী ব্যাহত হতে থাকে এবং জটিলতর হয়ে ওঠে। মানুষের জন্ম থেকেই প্রায় জটিলতার আরম্ভ। আমাদের আজকের আশা আকাংক্ষা ও প্রবণতাকে ভাল করে বুঝতে হলে জন্ম থেকে আমাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখতে হবে।

অভিজাত এবং উচ্চশিক্ষিত পিতামাতার একমাত্র ছেলে, বয়স ১১ বছর—পড়াশুনায় দিন দিনই পিছিয়ে পড়ছে। স্কুল থেকে অভিযোগ আসে যে, সে স্কুলের ডেস্ক বেঞ্চ নষ্ট করে, দেয়ালে যা তা লেখে, দুর্বল ছেলেদের মারধোর করে, পেন্সিল, রাবার কেড়ে নেয়, ইত্যাদি। ভেবে ভেবে মা-বাবা কূলকিনারা পান না। কি করা যায়—কেন ছেলেটা এমন হয়ে যাচ্ছে? ছোটবেলা থেকেই ছেলেকে "মানুষ করা"-র চেষ্টার কোন ত্রুটি তাঁরা করেন নি। জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পরিবারের উচ্চাকাংক্ষা সামনে বড় করে তুলে ধরা হয়েছিল। সবদিক দিয়ে তাকে আদর্শ করে তোলার চেষ্টায় শিশুর যে একটা স্বতন্ত্র সত্তা থাকতে পারে, তার আশা আকাংক্ষা প্রবণতা যে বাবা মার আশা আকাংক্ষা থেকে পৃথক্ হতে পারে তা ভুলেই গিয়েছিলেন তাঁরা। কোন ব্যবহারেই সামান্যতম ত্রুটি হওয়ার উপায় ছিল না ছেলেটির। কঠোর নিয়মের মধ্যে তার জীবন কাটাতে হোত। অতি অল্প বয়সে তার লেখাপড়া আরম্ভ হয়। পাঁচ বছর বয়স থেকেই গৃহশিক্ষক আসতে শুরু করলেন। ছয় বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই সে স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে গেল। প্রথম থেকেই আরম্ভ হোল পারিবারিক আইন-

কানুনের সঙ্গে মানসিক দ্বন্দ্ব। নানারকম চটকদার জিনিস বাড়ীর চার দিকে সাজানো কিন্তু কিছুই তার ধরবার অধিকার নেই—ধরতে গেলেই আসবে বাধা। জল কাদা নিয়ে স্বাধীন-ভাবে খেলবার ইচ্ছে, কিন্তু ওসব নোংরামি চলবে না। পড়তে মন বসছে না, কিন্তু তবু পড়তে বসতে হয়। আরও একটু বড় হলেই সে দেখতে পেল যে মা-বাবার আশা আকাংক্ষার সঙ্গে সে তাল রেখে চলতে পারছে না। আরও দশটি ছেলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সে জয়ী হতে পারছে না। স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর এটা আরও বেশী করে সে উপলব্ধি করতে পারল। স্বাভাবিক পথে চললে, পড়াশুনায় যতটুকু মন বসত, মনের অশান্তির জন্য তাও সম্ভব হোত না। বয়সের তুলনায় উঁচু ক্লাশে ভর্তি হওয়ায়, আরও পাঁচটি ছেলেকে ছাড়িয়ে যাওয়া তো দূরের কথা, তাদের সঙ্গে তাল রেখে চলাই সম্ভব হচ্ছিল না। বুদ্ধি তার সাধারণ দশজনের মতই ছিল। অবচেতন মনে পিতামাতার বিরুদ্ধে তার নালিশ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠতে লাগল—মা-বাবা যা বলেন তার বিরুদ্ধে চলার প্রবণতা তার মনে জেগে উঠল। কিন্তু প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রে তা সম্ভব ছিল না। স্কুলের আসবাবপত্র নষ্ট করে, তার অবচেতন মন পিতামাতার বিরুদ্ধেই প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করছিল। পিতামাতাকে সবরকম আইনকানুনের প্রতিভূ বলে তার অবচেতন মন কল্পনা করেছিল। অপরদিকে তার মনে হীনতাবোধও প্রবলভাবে জেগেছিল। সকলের উপরে নিজের স্থান প্রতিষ্ঠিত করবার আকাংক্ষা তার কিছুতেই দূর হচ্ছিল

না। তাই সে দুর্বল ছেলেদের মারধোর করে ঐ আকাংক্ষার তৃপ্তি সাধন করতে চেষ্টা করত।

সমাজে মানসিক রোগের দু'টি প্রধান বীজাণু

সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশের জটিলতা দিন দিনই বেড়ে চলেছে। ফলে আশা আকাংক্ষা ও প্রবণতার সৃষ্টি এবং তাদের নিবৃত্তির মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে চলা একরকম অসম্ভব হয়ে পড়েছে। আমাদের সমাজের মত দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজের পক্ষে একথা অধিকতর সত্য। সামাজিক পরিবর্তন সবদিকে তাল রেখে চলতে পারছে না। একদিকে পরিবেশ আমাদের মনে যে আশা আকাংক্ষা প্রবণতার সৃষ্টি করেছে অপরদিকে তা'-ই আবার তা' পূরণের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এজন্যে বর্তমান সমাজে ছেলেমেয়ে মানুষ করা এত কঠিন হয়ে পড়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে—ঐহিক সুখ ভোগ এবং যৌন-সম্ভোগের আকাংক্ষা বর্তমান জগতের প্রধান দুইটি দ্বন্দ্বের কারণ। কোনও না কোনরূপে আমাদের প্রায় সকলের জীবনের উপরই এরা অল্পবিস্তর প্রভাব বিস্তার করেছে। তাদের জন্ম কিন্তু উপরোক্ত অসম সামাজিক পরিস্থিতি থেকে।

একদিন কাজের শেষে বাড়ীতে ফিরে আদেশ পেলাম, অনেক কষ্টে দুমাস আগে গ্রাম থেকে সংগৃহীতা ঝিকে অবিলম্বে দূর করে দিতে হবে। তার অপরাধ, সে আমাদের "জবা-কুসুম" তেল চুরি করে মাথায় মেখেছে। তার মাথার গন্ধই এই অপরাধের প্রমাণ। কিছুদিন থেকে নাকি দুধ খেয়ে তাতে

জল মেশানোও শুরু করেছিল। মেয়েটি যখন গ্রামে ছিল তখন "জবাকুসুম" তেল মাখবার আকাংক্ষা বা রোজ দুধ খাওয়ার ইচ্ছা তার মনে ছিল না। কিন্তু শহরে "বাবু"র বাড়ীতে কাজ করতে এসে দু'টি আকাংক্ষাই তার মনে ধীরে ধীরে জেগে উঠেছিল, অথচ তাদের নিবৃত্তির কোন পথ ছিল না। পরস্বাপ-হরণের বিরুদ্ধে আজকাল আর সমাজে তীব্র নীতিবোধ নেই। ফলে সে আকাংক্ষা নিবৃত্তির জন্য চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করেছে। একবার যখন আকাংক্ষা নিবৃত্তির সহজ পথ খুঁজে পেয়েছে তখন ঐ পথেই আরও অনেক অপূর্ণ আকাংক্ষার তৃপ্তি সাধনের চেষ্টা সে করবে তাতে সন্দেহ নেই। প্রথম আরম্ভ হয়েছিল দুধ চুরি, তারপর মাথার তেল—শেষে টাকা পয়সা চুরি আরম্ভ হতেও বেশী দেরী হবে না।

আধুনিক বিজ্ঞান ঐহিক সুখ উপভোগের আকাংক্ষাকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গেছে, কিন্তু সমাজে বণ্টন ব্যবস্থায় গলদের ফলে আমাদের অধিকাংশেরই ঐ আকাংক্ষা পূর্ণ হচ্ছে না। তাই নানাভাবে মানসিক দ্বন্দ্বে এবং অবাঞ্ছিত ব্যবহারে তাদের পরিণতি হচ্ছে। যৌন-সম্ভোগ নিয়ে মানসিক দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে একই কথা খাটে। বর্তমান পরিবেশ আমাদের যৌন-সম্ভোগের আকাংক্ষাকে তীব্রতর করে তুলেছে, অথচ অর্থ নৈতিক কারণে বিবাহের বয়স দিনদিনই পিছিয়ে পড়ছে। অনেককে আবার অবিবাহিত জীবনই কাটাতে হচ্ছে। স্বামী-স্ত্রী ব্যতীত যৌন-সম্পর্ককে সমাজ অত্যন্ত গর্হিত বলে মনে করছে। ফলে যৌন আকাংক্ষার অতৃপ্তি অনেক ক্ষেত্রেই মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ করছে।

মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার চেষ্টায় পিতামাতা বা শিক্ষক

শারীরিক স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সাধারণতঃ দুইরকম পন্থা অবলম্বন করা হয়—রোগ হলে তা আরোগ্যের চেষ্টা এবং যাতে রোগ না হতে পারে তার জন্য আগে থেকেই ব্যবস্থা অবলম্বন করা। মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারেও এই উভয় ব্যবস্থাই প্রযোজ্য। রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লে বিশেষজ্ঞের সাহায্য ছাড়া মাতাপিতা বা শিক্ষকের পক্ষে হয়তো প্রতিকার করা সম্ভব নয়। কিন্তু রোগের প্রথম অবস্থায় তাকে ধরতে পারাও কম লাভ নয় —সহজেই ভাল হওয়ার আশা থাকে। বিশেষ করে সামান্য সামান্য অসুস্থতার কারণ ঠিক করে একটু আধটু প্রতিকার করতে পারলে রোগ অনেকটা আপনা থেকেই সেরে যায়, বিশেষজ্ঞের কাছে আর যেতে হয় না। কি শারীরিক কি মানসিক অসুস্থতা, উভয় রোগ দূর করারই একটি অন্তর্নিহিত ক্ষমতা মানুষের রয়েছে। মানসিক স্বাস্থ্য যাতে আদৌ ক্ষুণ্ণ হতে না পারে সেই চেষ্টায় পিতামাতা এবং শিক্ষকের অবদান সব চাইতে বেশী। বাল্যকালে গৃহ ও বিদ্যালয়ই শিশুর প্রধান পরিবেশ। জন্মের পর থেকে কিছুদিন পিতামাতাই শিশুর প্রধান সঙ্গী। তাঁদের দ্বারাই প্রধানতঃ শিশুর প্রয়োজনবোধের সৃষ্টি এবং নিবৃত্তি। তাঁরা যদি শিশুর জন্মগত প্রবৃত্তি সম্বন্ধে অবহিত হয়ে তাদের পরিপূরক হিসাবে পারিবারিক ও বিদ্যালয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন— শিশুর প্রয়োজনবোধকে ব্যাহত না করে তার নিবৃত্তির ব্যবস্থাই যদি পরিবেশে থাকে তবে শিশু যে সুস্থ মনে বড় হতে পারবে তাতে সন্দেহ নেই। প্রয়োজন মনে করলে পরিবেশের

অদল-বদল দ্বারা (প্রধানতঃ তাঁদের নিজেদের ব্যবহার) শিশুমনের প্রয়োজনবোধের পরিবর্তনও সম্ভব। শিশু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক পরিবেশও তার উপর কাজ করে বটে, কিন্তু পরিবার এবং বিদ্যালয় সব সময়ই তার প্রধান পরিবেশ-রূপে থেকে যায়। পরিবার এবং বিদ্যালয় যদি শিশুর প্রয়োজন-বোধকে মোটামুটি তৃপ্ত করতে পারে, তবে সামাজিক পরিবেশ তার মানসিক স্বাস্থ্যের উপর সহজে মন্দ প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। পরিবার এবং বিদ্যালয়ের পরিবেশকে প্রয়োজন মত কিছুটা পরিবর্তনও আমরা সহজেই করতে পারি। ফলে শিশুর প্রয়োজনবোধ আশা আকাংক্ষা ও প্রবণতাকে বিকৃতি থেকে রক্ষা করে উপযুক্ত পথে পরিচালিত করতে পারি। পিতামাতা এবং শিক্ষক যদি মিলিতভাবে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের ভিত্তি গঠন করে দিতে পারেন, তবে ভবিষ্যতে সমাজ-জীবনের অনেক ঝড় ঝাপটাই সে সহজে সহ্য করতে পারবে।

২ মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার কয়েকটি নিয়ম

পারিবারিক পরিবেশ ও মানসিক স্বাস্থ্য

মা-বাবা ভাই-বোনই শিশুজীবনের সর্বপ্রথম পরিবেশ। পারিবারিক পরিবেশ মানসিক স্বাস্থ্যের অনুকূল হলে, শিশুর চরিত্র দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়; শিশুর মানসিক রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা জন্মায়; ফলে পরবর্তী জীবনের ঘাত প্রতিঘাত সহজে তার ক্ষতি করিতে পারে না। অপরদিকে শিশুকাল থেকেই প্রতিকূল পরিবেশে পড়ে গেলে, সহজেই মানসিক রোগের সৃষ্টি হয় এবং বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিকূলতর পরিবেশের আঘাতে রোগের জটিলতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। মানসিক ব্যাধির কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে গেলে অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায় যে তাদের সূত্রপাত শিশু-জীবনের পারিবারিক পরিবেশ থেকে।

অথচ মা-বাবা ভাই-বোন সকলেই শিশুর মঙ্গলাকাংক্ষী। আমাদের দেশের অধিকাংশ মা-বাবাই এখনও প্রাণ·দিয়েও সন্তানের ভাল করতে চান। মানসিক স্বাস্থ্যের আইন-কানুন মা-বাবার অনেকটা অজানা থাকার দরুণই শিশুকে পারিবারিক জীবনে প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে পড়তে হয়। পারিবারিক পরিবেশ সম্বন্ধে একটি সুবিধার কথা এই যে, ছোট গণ্ডীর মধ্যে বলে শিশুর মানসিক জীবনের প্রয়োজন অনুসারে তার কিছুটা

অদল বদল সহজেই করা চলে,। প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং কিছুটা চেষ্টা থাকলেই মা-বাবা শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যকে দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে দিতে পারেন।

দু'টি সাধারণ নিয়ম

পূর্ব অধ্যায়ের আলোচনা থেকেই শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দু'টি কথা হয়তো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

১। শিশুর স্বাভাবিক প্রবণতা ও প্রয়োজনবোধ সহজভাবে নিবৃত্তির পথ পেলে, শিশুর মানসিক বিকাশ স্বাভাবিক ভাবে চলবে।

দৃষ্টান্তঃ (ক) একবছর বয়স পর্যন্ত হাত বা আঙ্গুল চোষা শিশুর স্বাভাবিক প্রবণতা। চোষার ভেতর দিয়েই পরিবেশের সঙ্গে তার সম্বন্ধ, তার ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি। যা কিছু তার মুখের কাছে আসে তাকেই সে চুষতে চায়, এমন কি মায়ের নাক পর্যন্ত। স্বাস্থ্যহানির ভয়ে বা "বিশ্রি" দেখায় বলে শিশুকে এই কাজে বাধা দিলে, তার মানসিক স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা থাকে।

(খ) পিতামাতা উভয়েরই সাহচর্য লাভ শিশুর প্রয়োজনবোধের অন্যতম। পিতা শিশুকে যথোপযুক্ত সাহচর্য দিতে না পারলে তার মানসিক নিরাপত্তাবোধ ক্ষুণ্ণ হয়ে জটিল মানসিক রোগের সৃষ্টি করতে পারে।

২। পরিবেশের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকলে শিশুর মানসিক রোগ হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকবে—পরিবেশের প্রভাবে

শিশুমনে যে প্রয়োজনবোধের সৃষ্টি হয় পরিবেশে তার নিবৃত্তির ব্যবস্থা থাকলে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে।

দৃষ্টান্ত : প্রথম সন্তান। মেয়ে! আদরের আর সীমা নেই। সবসময়ই কোলে কোলে আছে। যা চাইছে তাই পাচ্ছে। মা-বাবার কাছ থেকে অতিরিক্ত মনোযোগ ও আদর পাওয়া তার প্রয়োজনবোধের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেল। তার দু'বছর বয়সের সময় মার কোলে এলো একটি ভাই। মা-বাবা দুজনেই ভাইকে নিয়ে ব্যস্ত। অথচ মেয়েটির মধ্যে মা-বাবার দ্বারাই সৃষ্ট প্রয়োজনবোধের আর নিবৃত্তি হচ্ছে না। ফলে প্রথম আরম্ভ হল কান্নাকাটি ; একটু মতের বিরুদ্ধে গেলেই অস্বাভাবিক ভাবে রেগে যাওয়া। তারপর দেখা দিল জিনিসপত্র ভাঙবার ও বই ছিঁড়বার প্রবৃত্তি। একদিন ভাইকে একা পেয়ে মুখ চেপে ধরল। মেয়েটি যে মনের দিক থেকে অসুস্থ হয়ে পড়ছিল তাতে আর সন্দেহ নেই।

শিশুর প্রবণতা

শিশুকে মানসিক রোগের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে সর্বপ্রথম তার প্রবণতা ও প্রয়োজনবোধ সম্বন্ধে পিতামাতাকে মোটামুটি জ্ঞান সংগ্রহ করতে হবে। মানসিক অসুস্থতা বিষয়ে জ্ঞানের ক্ষেত্রে ফ্রয়েড সাহেবকেই প্রধান পথপ্রদর্শক বলে ধরা হয়। তাঁর মতে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির ভিতর দিয়েই শিশুর মানসিক বিকাশ হতে থাকে। সকল বয়সে একইভাবে যে এই পরিতৃপ্তি হয় এমন নয়—বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এই পরিতৃপ্তির পথ পরিবর্তিত

হয়। জন্ম থেকে এক বৎসর পর্যন্ত মুখের মাধ্যমেই শিশু তার ইন্দ্রিয় তৃপ্তির চেষ্টা করে। মায়ের বুকের দুধ চোষায় তার অপূর্ব পরিতৃপ্তি। যে শিশু কোন কারণে দশমাস বয়স অবধি এই সুযোগ পায় না, তার নানারূপ মানসিক বিকৃতি দেখা দেওয়া অসম্ভব নয়। মায়ের স্বাস্থ্যহানি, উপযুক্ত খাদ্যের অভাব, নূতন সন্তানের আগমন, ধৈর্যের বা সময়ের অভাব, দেহ-সৌষ্ঠবের ক্ষতি হওয়ার আশংকা, ভ্রান্ত ধারণা প্রভৃতি নানাকারণে আজকাল অধিকাংশ শিশুরই জীবনের সর্বপ্রথম আকাংক্ষার পূর্ণ-তৃপ্তি হয় না। তোলা দুধ খাওয়াতে হলে শিশুর পক্ষে বোতল থেকে চুষে খাওয়াই ভাল। কিন্তু আমাদের দেশের অনেক মা (প্রধানতঃ ধৈর্যের অভাবে) তাও না করে ঝিনুকের সাহায্য নেন। তাতে শিশুর মানসিক ক্ষতি হয় আরও বেশী। এইসব শিশুদের অনেকেই বড় হয়ে খাওয়া নিয়ে মাকে রীতিমত ভোগায়—খাওয়ার মেজাজ কখনও তাদের যায় না। নিজের হাত এবং যা কিছু পায় তাই চুষতে চেষ্টা করাই এই বয়সের শিশুর স্বাভাবিক ধর্ম। এতে বাধা দিলে ভাল না হয়ে ক্ষতিই বেশী হয় (অবশ্য যা কিছু শিশুর চুষবার সম্ভাবনা আছে তা যথাসম্ভব পরিষ্কার রাখা আবশ্যক)।

এর পর ২½ বছর বয়স পর্যন্ত মলমূত্র নির্গমনের মাধ্যমে শিশুদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি লাভের চেষ্টা চলে। ময়লার মধ্যে পড়ে থাকতে শিশুর বিরক্তি না হয়ে বরং আনন্দই হয়। সুযোগ পেলেই মলমূত্র নিয়ে তারা খেলতে শুরু করে দেয়। মা হয়তো কাজে ব্যস্ত ; ছেলে ইতিমধ্যে দুহাত দিয়ে সারা গায়ে এবং

বিছানায় নোংরা মেখে সানন্দে খেলা করছে—মাকে দেখলে আরও খুশী। অনেক জননীই এইসব ব্যাপারে বিরক্ত হন—ধমক দেন, এমন কি অতিরিক্ত রেগে গেলে কখনও চড় চাপড়ও বসিয়ে দেন। বেশীর ভাগ মা-ই শিশুকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নোংরা থেকে সরাতে চেষ্টা করেন। পরে বার বার শিশুকে শিস্ দিয়ে প্রস্রাব করতে শেখান এবং নির্দিষ্ট সময়ে পায়খানা করতেও অভ্যাস করান। অনেক মা এই চেষ্টায় সাফল্য লাভ করেন কিন্তু এতে শিশু তার জীবনের একটি প্রধান তৃপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়। এর ফলে তার মনে উৎকণ্ঠা ও অতৃপ্তির সৃষ্টি হয় এবং তার ভবিষ্যৎ জীবনেও তার ছায়া পড়ে। কখনও কখনও এর ফলে কোষ্ঠ-কাঠিন্যও দেখা দেয়। পরবর্তী জীবনেও তা দূর হয় না। ২½ বছর থেকে ৬/৭ বছর বয়স পর্যন্ত শিশু তার জননেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তৃপ্তি পেতে চায়। এই সময়ে ছেলেমেয়েদের প্রায়ই জননেন্দ্রিয় নিয়ে নাড়াচাড়া করতে দেখা যায়। অধিকাংশ মা-বাবাই এটা অত্যন্ত লজ্জাকর ও নীতিবিরুদ্ধ মনে করেন এবং ভর্ৎসনা ও শাস্তি দিয়ে এ অভ্যাস ছাড়াতে চেষ্টা করেন। মা-বাবার কাছে এই বয়সের ছেলেমেয়েদের আত্মরমণের চেষ্টা আরও অধিক মনস্তাপের কারণ হয়। সকল মা-বাবার চোখে হয়তো এ ব্যবহার ধরা পড়ে না, কিন্তু যাঁদের পড়ে তাঁদের অশান্তির সীমা থাকে না। ছেলেমেয়েদেরও লাঞ্ছনার সীমা থাকে না। আমরা অনেকেই জানি না যে এই বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই ব্যবহার একান্তই স্বাভাবিক। এ নিয়ে অনর্থক হৈ চৈ না করলে, এর বাড়াবাড়িও হয় না। স্বাভাবিক নিয়মে বয়সের

সঙ্গে সঙ্গে এই অভ্যাস চলে যায়। কিন্তু ছেলের "চরিত্র" নষ্ট হওয়ার আশংকায় যে সব পিতামাতা কঠোর শাসনের দ্বারা এইসব ব্যবহার দমন করতে চান, তারা না জেনে ছেলেরই অমঙ্গল করেন। এই বয়সেই মেয়েদের বাবার প্রতি এবং ছেলেদের মায়ের প্রতি বেশী আকর্ষণ দেখা যায়। কোন কারণে এই আকর্ষণ প্রকাশের সুযোগ না পেলে ছেলেমেয়েদের মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। ৬।৭ বছর বয়স থেকে বছর চারেকের জন্য ছেলে-মেয়েদের যৌন প্রবৃত্তির আর কোন প্রকাশ দেখা যায় না। তাদের আত্ম-তৃপ্তির চেষ্টা নিজেদের শরীর ছেড়ে বন্ধুবান্ধবকে আশ্রয় করে। ছেলেমেয়েরা তখন দলবদ্ধ খেলাধূলার মধ্যে তৃপ্তি খোঁজে। মা-বাবার প্রতিও আকর্ষণ কমে যায়। বাড়ীতে যেন থাকতেই চায় না। পাড়ার ছেলেমেয়েদের নিয়ে বেশ একটা দল পাকিয়ে নানারকমের খেলাধূলায় মেতে থাকে। ছেলের এই বহির্মুখিনতা বাবা মাকে মনে মনে পীড়া দেয়। ছেলের পড়াশুনার ক্ষতি হচ্ছে, সে "দুষ্টু" ছেলেদের সঙ্গে মিশে মিশে দুষ্টু হয়ে যাচ্ছে এইসব ভেবে তারা চিন্তিত হয়ে পড়েন। বিশেষ করে আমরা ছেলেমেয়েদের পড়াশুনায় তাড়াতাড়ি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে বর্তমানে যে ভাবে চাপ দিতে আরম্ভ করেছি তাতে এই বয়সের ছেলেমেয়েদের স্বাভাবিক বহির্মুখিনতা এবং খেলাধূলার প্রবৃত্তিকে দমন করতে চেষ্টা করে ছেলেমেয়েদের মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করছি।

সাধারণতঃ এগারো বারো বৎসর বয়স থেকে কৈশোরের আরম্ভ বলা যেতে পারে। এই সময় ছেলেমেয়েদের যৌনবোধ

আবার জেগে ওঠে। তখন ছেলে মেয়ের এবং মেয়ে ছেলের সঙ্গ মনে মনে কামনা করে। যৌনক্ষমতার বিকাশের জন্য আত্মরমণের চেষ্টাও আবার দেখা দেয়। যৌন ব্যবহার এবং ছেলেমেয়েদের মেলামেশা নিয়ে আমাদের সমাজের নিয়ম-কানুন অত্যন্ত কঠোর হওয়ার দরুণ কৈশোরের প্রারম্ভে মনে নানা মানসিক দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। বাবা মায়ের কাছ থেকেও ঐ বয়সের ছেলেমেয়েরা নিজেদের মনের সমস্যা গোপন রাখে। তাঁদের কাছে মনের অশান্তির কথা প্রকাশ করে সাহায্য চাইতে পারে না। অপর দিকে ঐ বয়সে আদর্শবাদও প্রবল হয়ে ওঠে। ফলে কিশোর কিশোরীর মনে অপরাধ-বোধ অত্যন্ত প্রবল হয় এবং কেবলই মনে হয় যা করা উচিত তা তারা করতে পারছে না। পিতামাতা যদি প্রথম থেকেই এমন ভাবে চলেন যাতে যৌন সমস্যার কথাও তাদের কাছে গোপন করার প্রয়োজন হয় না—ছেলেমেয়েরা তাদের মানসিক দ্বন্দ্ব নিয়ে পিতামাতার সঙ্গে খোলাখুলিভাবে আলোচনা করতে পারে, তাহলে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে অবাঞ্ছিত ব্যবহারের সৃষ্টি অনেক কমে যায়।

ফ্রয়েড সাহেবের মতে যে বয়সের যে ব্যবহার তা দেখা না দিলে বা একবয়সের ব্যবহার আরএক বয়স পর্যন্ত চলতে থাকলে বুঝে নিতে হবে যে ছেলেটির বা মেয়েটির মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে এবং যে কোন সময় রোগের লক্ষণ দেখা দিতে পারে। ধরা যাক—যে ছেলে ৩ বছর বয়সেও আঙ্গুল চুষে চলেছে বা ঘুমিয়ে মুখ দিয়ে চুক্ চুক্ শব্দ করছে হঠাৎ হয়তো একদিন দেখা যাবে যে সে অহেতুক ভয়রোগে আক্রান্ত হয়েছে। যে ছেলে

৫ বছর বয়স অবধি অসাড়ে বিছানা ভেজায়, একদিন হয়তো দেখা যাবে যে সে তোত্‌লামি আরম্ভ করেছে। অপর দিকে এক বছরের মধ্যে যে বিছানায় মলত্যাগ বা প্রস্রাব করা ছেড়ে দিয়েছে, ১৩ বছর বয়সে হয়তো দেখা যাবে যে তার যৌন-প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ যে সব রোগের উল্লেখ করা হল, ঠিক তাই যে হবে এমন কোন কথা নয়। পারিপার্শ্বিক ভেদে অন্য যে কোন মানসিক রোগের সৃষ্টি হতে পারে। ছেলেমেয়েদের কয়েকটি সাধারণ ব্যবহার কখন বন্ধ হওয়া ভাল (বেশী আগেও নয় আবার বেশী পরেও নয়) তার একটি তালিকা নীচে দেওয়া হল।

ব্যবহার	ছাড়ার বয়স
১। বুকের দুধ খাওয়া	১০মাস
২। বিছানায় মলত্যাগ	২ বৎসর
৩। দিনে বিছানায় প্রস্রাব	২½ বৎসর থেকে
৪। রাত্রে বিছানায় প্রস্রাব	৩ বৎসর থেকে ৩½
৫। আঙ্গুল চোষা	১ বৎসর থেকে ২
৬। আত্মরমণ (Masturbation)	কখনও একেবারে বন্ধ নাও হতে পারে

শিশুমনের প্রয়োজনবোধ

শিশুমনের প্রধান প্রধান প্রয়োজনবোধগুলি সম্বন্ধেও আমাদের কিছু জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

১। নিরাপত্তাবোধের প্রয়োজন শিশুমনের পক্ষে সর্বাধিক।

জন্মের পর নিজেকে সে অত্যন্ত অসহায় মনে করে। একটু শব্দেই সে চমকে ওঠে, একটু এদিক সেদিক হলেই কেঁদে আকুল হয়। মায়ের বুকে শুয়ে দুধ খেতে খেতে সে অনেকটা নিরাপদ বোধ করে। বাবার প্রশস্ত বুকের মধ্যে আশ্রয় পেয়েও সে অনেকটা স্বস্তি পায়। এক কথায় শিশুমনের নিরাপত্তাবোধের জন্য মাতাপিতা উভয়ের সাহচর্যই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়—একের অভাব অন্যের দ্বারা পূর্ণ হয় না। মাতাপিতা দুইজন দুইভাবে শিশুমনের উপর ক্রিয়া করেন। একজনের ভালবাসা, কোমলতা, অপরের স্নেহ, দৃঢ়তা শিশুমনে নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টির জন্য সমান প্রয়োজনীয়। নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টি হলে শিশু সহজ সরলভাবে পারিপার্শ্বিকের সম্মুখীন হতে পারে।

২। প্রচুর পরিমাণে ভালবাসা পাওয়াও শিশুমনের একটি অন্যতম প্রধান প্রয়োজনবোধ। প্রায় জন্ম থেকেই শিশুর ভালবাসা আদান প্রদান করবার ক্ষমতা জন্মায়। এই আদান-প্রদানের মাধ্যমেই শিশুর মানসিক বিকাশ হতে থাকে। প্রকাশ না করতে পারলেও নিতান্ত শিশুকাল থেকেই সে নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়—নানাভাবে তার ইচ্ছা অনিচ্ছা, অসুবিধাবোধ প্রভৃতি প্রকাশ পায়। শিশুকেন্দ্রিক দৃষ্টি থাকলে আমাদের চোখেও তা ধরা পড়ে। অনেক মা-ই ছেলে কখন কি চায়, তার কি অসুবিধা হচ্ছে বুঝতে পারেন। মাতাপিতার ভালবাসা প্রচুর পরিমাণে না পেলে, শিশুর মনের কথা বুঝতে না পারলে, তার সমস্যার সমাধান এবং প্রয়োজনবোধ নিবৃত্তির চেষ্টায় একাগ্রদৃষ্টি

না থাকলে শিশুর মানসিক বিকাশ স্বাভাবিক পথে চলতে পারে না।

৩। শিশুমনে বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন মাধ্যমে ইন্দ্রিয় তৃপ্তির যে সব আকাংক্ষা জন্মায় তাদের তৃপ্তিরও প্রয়োজন। এদের সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

শিশুমনের ভয়

যে পরিবেশে আমাদের ছেলেমেয়েরা সাধারণতঃ মানুষ হয়, তাতে শিশুমনে প্রধানতঃ তিনটি ভয়ের স্থষ্টি হয়।

১। **পরিত্যক্ত হওয়ার ভয়** ঃ মা কাছে শুয়ে আছেন, শিশু মনের আনন্দে খেলছে, কিন্তু যেই তিনি কোন কাজের জন্য চোখের আড়াল হলেন অমনি পাঁচ মিনিটের মধ্যে শিশু কেঁদে উঠল। "বাপন্"-কে ভাই-এর কাছে রেখে আমরা মেয়েদের নাচ দেখতে গিয়েছিলাম। বাপন্ পরিচিত মুখ একটাও না দেখে ভাবলে মা-বাবা তাকে ফেলে চলে গেছে। তাই ছুই ঘণ্টার মধ্যে তার কান্নার উপশম হল না। আমাদের কাছে এসে আরও আধ ঘণ্টা কেঁদে তবে থামল। এই ঘটনার আগে বোনেদের কাছে অনেকক্ষণ একটানা রয়েছে—মা-বাবা কাছেই কোথাও আছেন এই বিশ্বাসে। কিন্তু এই ঘটনার পর না দেখে থেকে সে অল্পক্ষণের জন্যও আমাদের ছুইজনের একজনকে থাকতে চাইত না। ৫ মাসের ছেলে তবু অনুভূতি শক্তি কত প্রখর! সকল ছেলেমেয়েরই এই রকম থাকে। একটু বুঝতে শিখলে মা হয়তো নিছক ঠাট্টা করে

মরে যাবেন বলে শিশুকে ভয় দেখান, শিশুর মন আতঙ্কে কুঁক্‌ড়ে যায়।

২। **মা-বাবার ভালবাসা হারানোর আশংকা**ঃ ইহাও শিশুর মনে প্রবল থাকে। মা হয়তো ঠাট্টা করে রাগের ভঙ্গীতে বড় বড় চোখ করে ছেলের দিকে তাকান, ছেলে সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট ভেঙ্গে কেঁদে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে মা আবার কত ভাবে তাকে আদর করেন—ছেলে শান্ত হয়। মা বাবার কাছ থেকে নানাভাবে আদর পাওয়ার আকাংক্ষা সব ছেলেমেয়েরই থাকে। তাই তাদের বিরক্তি, ধমক, শাসন তার মনে সুদূরপ্রসারি প্রতি-ক্রিয়ার সৃষ্টি করে। মা-বাবার ভালবাসা হারানোর ভয় তার মনের নিরাপত্তাবোধকে ক্ষুণ্ণ করে।

৩। **অঙ্গহানির আশংকা**ঃ ইহা শিশুমনের আর একটি ভয়। মা-বাবা সামান্য শারীরিক শাসন করলেই এই ভয় তাদের মনে প্রবল হয়ে ওঠে। শরীর শিশুর কাছে একান্ত নিজস্ব বলে মনে হয়। শরীর ছাড়া মনের অনুভূতি পৃথক্‌ভাবে তখনও তার হয়নি। তাই কোন কারণে ভয় পেলে বা সামান্য আঘাত পেলেই তার মনে হয়, তার কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষতি হবে বুঝি। একটু বড় হলে শিশুর স্বপ্নের মধ্যে এই ভয়ের পরিচয় পাওয়া যায়।

মানসিক রোগের প্রতিকার

শারীরিক স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সাধারণতঃ দুইভাবে চেষ্টা করা হয়—রোগ হলে তার উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, আর

রোগ যাতে হতে না পারে তার জন্য আগে থেকেই সাবধান হওয়া। রোগ প্রতিরোধের চেষ্টার উপরই বর্তমানে বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রেও একই কথা সত্য। রোগ প্রতিরোধ করার চেষ্টার গুরুত্ব এ ক্ষেত্রে আরও বেশী। কারণ একবার মানসিক রোগ হলে তা সারানো সময়সাপেক্ষ। আবার, মানসিক রোগ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞের সংখ্যাও আমাদের দেশে খুব বেশী নয়। তাই সহজে যাতে মানসিক রোগ হতে না পারে সে চেষ্টাই প্রধান কর্তব্য। পারিবারিক পরিবেশ কি ভাবে গড়ে তুলতে পারলে মানসিক রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা কমতে পারে তাই আলোচনা করে দেখা যাক।

মা-বাবা এবং শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য

আগেই বলা হয়েছে যে মা এবং বাবা উভয়ের ভালবাসা এবং সঙ্গ শিশুর প্রয়োজন। আমাদের দেশে কেমন একটা ধারণা আছে যে শিশু প্রতিপালন শুধু মায়ের কাজ। বাবার যথেষ্ট ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও প্রত্যক্ষভাবে তিনি শিশু প্রতিপালনে অংশ গ্রহণ করেন না। সময়ও হয়তো তাঁর থাকে না। সারা দিন রাত্রে শিশু হয়তো একঘণ্টাও তাঁকে দেখতে পায় না। অনেক পিতা আবার নিজেদের শিশুপালনে অপটু মনে করে শিশুকে কোলে নিতেই ভয় পান। কিন্তু পিতার সাহচর্য ব্যতীত শিশুর মানসিক বিকাশ ক্ষুণ্ণ হতে বাধ্য। বাবার পুরুষোচিত শক্তি, তাঁর দৃঢ়তা, সাংসারিক অভিজ্ঞতা এবং তাঁর

উপর মায়ের নির্ভরশীলতা শিশুর মনে বিশেষ নিরাপত্তাবোধের সৃষ্টি করে। বাবার বলিষ্ঠ হস্ত ও প্রশস্ত বক্ষে আশ্রয় পেয়ে শিশু জটিল পরিবেশের সম্মুখীন হতে সাহস পায়। শিশু প্রতিপালনের প্রায় সকল কাজেই বাবা অংশ গ্রহণ করতে পারেন। প্রথম প্রথম ভয় হতে পারে—এত কচি ছেলে কোলে নিতে পারব ত, দুধ খাওয়াতে গিয়ে ছেলে যদি বিষম খায়, ইত্যাদি, কিন্তু সাহস করে এগিয়ে এলে দেখা যায় যে কোন কাজই তেমন কিছু শক্ত নয়। শুধু তাই নয়, শিশু প্রতিপালনে মায়ের মতো বাবাও সমান আনন্দই উপভোগ করবেন। প্রত্যক্ষ-ভাবে শিশু প্রতিপালনে অংশ গ্রহণ না করলেও শিশুসেবায় মাকে সঙ্গদান করলেও মা-বাবা ও শিশুর মধ্যে বন্ধন দৃঢ়তর হয়ে উঠবে। এই বন্ধন শিশুর মানসিক বিকাশের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। মা হয়তো শিশুকে খাওয়াচ্ছেন বা তার জামা-কাপড় বদলাচ্ছেন, এই সময় বাবা যদি শুধু স্নেহভরে চেয়েও থাকেন তাও শিশুর সঙ্গে তাঁর মধুর সম্বন্ধ স্থাপনে সাহায্য করে। শিশুপালনের আইন হিসাবেই বাবাকে এই কথা মনে রাখতে হবে যে মায়ের সঙ্গে শিশুর যেরকম অন্তরঙ্গতা জন্মায় বাবার সঙ্গেও ঠিক সেই রকম অন্তরঙ্গতা জন্মানো প্রয়োজন।

আপাতদৃষ্টিতে অবান্তর বলে মনে হলেও, মনে রাখতে হবে যে মা-বাবার মধ্যে দৃঢ় প্রীতির বন্ধন শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের জন্যে একান্ত প্রয়োজন। মা-বাবার মধ্যে অন্তরঙ্গতা শিশুর মনে নিরাপত্তাবোধ বাড়িয়ে তোলে। প্রায় ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই শিশুকে যাঁরা ভালবাসেন, সেবা যত্ন করেন তাঁদের

মনের সঙ্গে শিশুমনের ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপিত হয়—তাঁদের সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ প্রভৃতি শিশুর মনে প্রভাব বিস্তার করে। মা-বাবার মধ্যে মনোমালিন্য শিশুর নিরাপত্তাবোধকে খুব বেশী ক্ষুণ্ণ করে এবং সে পীড়িত বোধ করে।

একটি তিন মাসের শিশু পেটের যন্ত্রণায় খুব ঘন ঘন ভুগতো। এর কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে ধরা পড়ল যে মা-বাবার মধ্যে মতান্তর হওয়ার দরুণ মা প্রায়ই বিমর্ষ হয়ে থাকতেন মাঝে মাঝে কান্নাকাটিও করতেন। এই থেকেই ছেলের পেটব্যথার সূত্রপাত।

শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য ভাল রাখতে হলে মা-বাবার মানাসক স্বাস্থ্য স্বাভাবিক রাখতে হবে। মা-বাবার ব্যবহারের উপরই শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য নির্ভর করে। বেশীর ভাগ সময়ই মা-বাবারা শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের অনুকূল ব্যবহার করেন না। অনেক মাতাপিতাই শিশু সম্বন্ধে অত্যধিক খুঁতখুঁতে হয়ে পড়েন। "আরে আরে, ওকে মাটিতে দাঁড় করিও না, ঠাণ্ডা লাগবে", "ওমা, কি হবে, ও যে ৩।৪ বার হাঁচি দিয়ে ফেললে", "সর্বনাশ, তুমি ছেলেকে নিয়ে ট্রামে বাসে যেতে চাও, কি না কি রোগের বীজাণু ঢুকবে শরীরে তার ঠিক আছে"—এই ধরণের কথা বেশীর ভাগ খুঁতখুঁতে মায়ের মুখ থেকেই শুনতে পাওয়া যায়। অতিরিক্ত উৎকণ্ঠা রোগবিশেষ। এই রোগ মাতাপিতা নিজের অজ্ঞাতে শিশুর মধ্যে সঞ্চারিত করে দেন। একটু বড় হলে তার মধ্যেও উৎকণ্ঠা রোগ দেখা দেয়। ছেলেকে অতিরিক্ত আগলে রাখার ফলে সে স্বাভাবিকভাবে আত্মপ্রকাশের সুযোগ থেকে

বঞ্চিত হয় এবং স্বাধীনভাবে পরিবেশের সন্মুখীন হতে শিক্ষা পায় না, ফলে ভীতু .প্রকৃতির হয়ে পড়ে। বর্তমান জীবনধারায় অতিরিক্ত সংঘাতের ফলে মধ্যবিত্ত এবং উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে অনেকেই অতিরিক্ত উৎকণ্ঠা রোগে ভোগেন ফলে শিশু সম্বন্ধে উপরোক্ত মনোভাব ঐ শ্রেণীর মধ্যেই বেশী দেখতে পাওয়া যায়। অনেক মা-বাবা আছেন যাঁরা শিশু সম্বন্ধে অত্যন্ত উচ্চাকাংক্ষী। নিজেদের জীবনের যত অপূর্ণ সাধ আকাংক্ষা সবই তাঁরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের মধ্য দিয়ে পূর্ণ করে নিতে চান। প্রায় জন্মের পর থেকেই আরম্ভ হয় শিক্ষা। তাকে সবরকমে আদর্শ করে তুলতে হবে। ছেলেকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে সকলের কাছে তাকে নিয়ে গর্ব করা চলে। আরও দশটি ছেলের আগে তাকে বিছানায় পায়খানা প্রস্রাব ছাড়ানো চাই। বাড়ীতে অতিথি এলে তাকে কবিতা আবৃত্তি করে, বই পড়ে শোনাতে হবে এবং আরও অনেক বিষয়ে তাকে অদ্বিতীয় হতে হবে। মায়ের অধ্যবসায়, প্রচণ্ড শাসনও কম নয়, তাই ছেলের দুর্দশার আর অন্ত থাকে না। ছোটবেলা থেকেই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে পড়ে তার মানসিক দ্বন্দ্ব চরমে পৌঁছোয়। হীনতাবোধ তার মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে। মনে রাখতে হবে যে শিশুর একটা স্বকীয় পরিণতি আছে। মা-বাবার ব্যর্থ আকাংক্ষা তৃপ্ত করতে গিয়ে সন্তানের নিজের জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে। তাকে দিয়ে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করাতে গেলে লাভের চাইতে ক্ষতির পরিমাণই হবে বেশী। তার নিজস্ব প্রবণতা ও প্রয়োজনবোধের

নিবৃত্তি যাতে স্বাভাবিকভাবে হয় তার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। এইভাবে চল্‌লেই ছেলের ভবিষ্যৎ জীবন উন্নততর ও শান্তিপূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। আমরা মা-বাপরা শিশুকে যেন আমাদের নিজেদের প্রয়োজনবোধ নিবৃত্তির যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার না করি। আমাদের তীব্র প্রতিযোগিতামূলক সমাজে আমরা আমাদের সন্তানদের টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলার চেষ্টা যেন না করি।

বেশী স্নেহপ্রবণতার দরুণ কোন কোন মা-বাবা শিশুকে সব কিছুতেই প্রশ্রয় দিয়ে যান। কেউ কেউ আবার ভুল করে ভাবেন যে শিশুকে কোন কিছুতে বাধা না দেওয়াই বুঝি আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক নীতি। শিশুর মানসিক বিকাশ যদি স্বাভাবিক পথে অগ্রসর হয়, তাহলে তার কোন ইচ্ছাপূরণেই বাধা দেওয়া উচিত নয়, একথা সত্য। কিন্তু দিন দিনই আমাদের পরিবেশ এত জটিল হয়ে পড়ছে, মাতাপিতার মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্যহীনতা এমনভাবে বেড়ে চলেছে যে প্রায় জন্মের পর থেকেই শিশুর প্রয়োজনবোধ বিকৃত হতে আরম্ভ করে। নির্বিচারে বিকৃত প্রয়োজনবোধের নিবৃত্তির চেষ্টা করে মা-বাবা সেই বিকৃতিরই প্রশ্রয় দিয়ে যান। যেমন, ছেলে একটুও খেলা করতে চায় না, সব সময়ই শুধু কোলে কোলে থাকবে নয়তো শুধু কান্নাকাটি করবে। আবার যখন যা দেখবে তাই খাওয়া চাই। মা-বাবা আহার নিদ্রা ত্যাগ করে সব সময় ছেলেকে কোলে কোলে রাখেন। কান্না অসহ্য হয়ে ওঠার দরুণ বাধ্য হয়েই ছেলে যা খেতে চায় তাই তাকে দিতে হয়। মা-বাবা কেউই বোঝেন না যে এই সব ব্যবহার মানসিক স্বাস্থ্যহীনতার লক্ষণ।

প্রথম প্রথম চেষ্টা করলে সহজেই হয়তো এই বিকৃতির হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায়। কিন্তু বিকৃত প্রয়োজনবোধের মধ্যে পরিবর্তন আনতে হলে প্রথমেই তার কারণ নির্ধারণ করতে হবে। অনেক সময় মা-বাবার ব্যবহারের মধ্যেই শিশুর এই বিকৃত প্রয়োজনবোধের কারণ পাওয়া যায়।

আগেই বলা হয়েছে কোন কারণে মা-বাবা দুজনের স্নেহই সমপরিমাণে না পেলে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুতর ক্ষতি হয়। আমাদের দেশের মা-বাবারা নিজেদের সন্তানদের ভালবাসেন না এমন ঘটনা বড় দেখা যায় না। কিন্তু মা-বাবার স্নেহপ্রকাশের ভঙ্গীর মধ্যে তারতম্য থাকতে পারে। এতে অনেক সময় শিশুমনে সমস্যার সৃষ্টি করে। মা-বাবার শিশুকে শুধু ভালবাসলেই চলবে না, শিশুর মনের মত করে তাঁদের ভালবাসার প্রকাশও দেখাতে হবে। ধরুন কোন পিতা সন্তানদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য উদয়াস্ত খেটেই চলেছেন—নিজের স্বাস্থ্যের দিকেও নজর দিচ্ছেন না। কিন্তু সারাদিনের মধ্যে ছেলেমেয়েরা তাঁর সঙ্গ একটুও পাচ্ছে না। যখনও বা তারা বাবাকে পাচ্ছে তখনও অতিরিক্ত পরিশ্রম ও ব্যর্থতায় পীড়িত মানুষটির কাছ থেকে শুধু বকুনিই খাচ্ছে। অন্যদিকে মা হয়তো স্বভাবতঃই একটু খুঁতখুঁতে। তাঁর নিজের সম্বন্ধে অসন্তুষ্টি অবচেতন মনে পুঞ্জীভূত হয়ে থাকার জন্য কোন কিছুতেই হয়তো তার মন ওঠে না। সব সময়ই হয়তো তিনি ছেলেমেয়েদের দোষ ধরছেন। পাড়ার অন্যান্য ছেলেমেয়েদের তুলনায় তাঁর ছেলেমেয়েরা যে খারাপ তাই সব সময় প্রমাণ করে চলেছেন। ছেলেমেয়েরা সব সময়ই

বকুনি খাচ্ছে। কিন্তু ছেলেমেয়েদের প্রতি ভালবাসায় তাঁর অন্তর পূর্ণ। কিন্তু এই ভালবাসার প্রকাশ হচ্ছে বকুনির মাধ্যমে। ছেলেমেয়েদের কাছে কিন্তু এরকম মা-বাবা স্নেহশীল বলে বিবেচিত হবেন না। তারা নিজেদের মা-বাপের স্নেহ থেকে বঞ্চিত ভেবে অসহায় বোধ করবে। যে ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই ভাব জন্মেছে তাদের মানসিক স্বাস্থ্য কিছুতেই স্বাভাবিক পথে চলতে পারে না।

সন্তানে সন্তানে স্নেহের তারতম্য অনেক সময় ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বিপ্লব সৃষ্টি করে। মা-বাবারা জোর করে অস্বীকার করলেও যে-কোন নিরপেক্ষ দর্শকের চোখেই সন্তানে সন্তানে নানারকম তারতম্যপূর্ণ ব্যবহার চোখে পড়ে (সকলের প্রতি প্রচুর ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও)।

অন্তরে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হতে না পারলেও বাইরের ব্যবহারে যথাসাধ্য নিরপেক্ষ হতে চেষ্টা করতে হবে। পড়াশুনায় ভাল ছেলের প্রতি একরকম ব্যবহার আবার খারাপ ছেলের প্রতি অন্যরকম ব্যবহার, ছেলের প্রতি একরকম ব্যবহার, মেয়ের প্রতি অন্য রকম ব্যবহার দুজনেরই ক্ষতি সাধন করে। মাতাপিতার স্নেহ সমান ভাবে ভালমন্দ নির্বিচারে সবার উপর সমভাবে বর্ষিত হচ্ছে এই অনুভূতি শিশুর "মানুষ" হওয়ার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। তার অনভিপ্রেত ব্যবহারের জন্য মাতাপিতা ব্যথিত হতে পারেন, তাঁরা তাকে শাসন করতে পারেন, কিন্তু তাঁদের ভালবাসার কখনও তারতম্য হবে না, এই বোধ শিশুর মধ্যে না থাকলে তার মানুষ হওয়া প্রায় অসম্ভব।

আমাদের বর্তমান সমাজে মেয়েসন্তান অনেক সময় মা-বাবার কাছে অবাঞ্ছিত হয়ে পড়ে এবং তাঁরা তাঁদের মনের ভাব মেয়ের কাছে গোপন করতে বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেন না। বিয়ের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘন ঘন সন্তান হলে তারা কোন কোন মা-বাবার কাছে অবাঞ্ছিত হয়ে পড়ে। পরে হয়তো তাদের প্রতিও মা-বাবার প্রচুর ভালবাসা জন্মায়। কিন্তু এর কুফল মাতাপিতা বা সন্তানের মন থেকে কখনও একেবারে দূর হয় না। প্রায় জন্মের পর থেকেই মাতাপিতার এইরকম মনোভাব শিশুমনে ধরা পড়ে। সন্তান সম্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গেই মা-বাবাকে তাকে সাদরে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হতে হবে, তা সে খোকাই হোক্ আর খুকীই হোক্।

অনেক সময় মা এবং বাবাকে ভিন্ন ভিন্ন সন্তানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করতে দেখা যায়। মা হয়তো ছেলেকে বেশী স্নেহ করেন এবং বাবা হয়তো মেয়েকে। এই নিয়ে মা-বাবার মধ্যে প্রায়ই মনোমালিন্যও হতে দেখা যায়। এই রকম পরিস্থিতি শিশুর মানসিক বিকাশে গুরুতর জটিলতা সৃষ্টি করে।

শিশুকে যথেচ্ছ ব্যবহারের সুযোগ দিতে হবে এমন কোন কথা নেই। শিশুর মধ্যে অবাঞ্ছিত ব্যবহার দেখা দিলে মাতাপিতা তা দূর করার চেষ্টা অবশ্যই করবেন। কিন্তু কোন্ ব্যবহার অবাঞ্ছিত এবং কোন্ ব্যবহার বাঞ্ছিত তার বিচার আমাদের সবসময় ঠিক হয় না। অনেক সময় আমাদের নিজেদের মানদণ্ড দিয়ে বিচার করি, শিশুর পক্ষে যা স্বাভাবিক ব্যবহার, যা তার মানসিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সেইরকম

ব্যবহারই আমরা দমন করতে চেষ্টা করি এবং শিশুর মনে জটিলতার সৃষ্টি করি। সেদিন একজন মা নালিশ জানাচ্ছিলেন যে, তাঁর ৮।৯ বছরের ছেলে বড় বহির্মুখী হয়ে পড়েছে—পড়াশুনা থেকে তার মন একেবারে চলে গেছে। কোন রকম শাসনেই কোন ফল হচ্ছে না। এই ছেলেটি এবং তার ভাই-ই পরস্পরের খেলার সাথী। সাধারণতঃ আর কোনও ছেলের সঙ্গে তাদের মিশতে দেওয়া হয় না। বহির্মুখিনতা ৮।৯ বৎসরের ছেলেদের স্বাভাবিক ধর্ম—সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে মিশবার আকাংক্ষাও তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। প্রয়োজনবোধের স্বাভাবিক নিবৃত্তিতে যত বাধা পড়বে ছেলের পড়াশুনায় মনও তত কমবে। শাসন করে আত্মরমণের চেষ্টাকে দমন করাও মা-বাবার এ রকম ভুলের আর একটি উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে।

যে ব্যবহার পরিবর্তন করবার চেষ্টার কোন প্রয়োজন নেই তাকে যেমন আমরা পরিবর্তনের চেষ্টা করি, আবার যে ব্যবহার পরিবর্তনের চেষ্টা একান্ত প্রয়োজন তাকে অনেক সময় অবহেলা করি। কোন্‌টি মানসিক রোগের লক্ষণ এবং কোন্‌টি স্বাভাবিক ব্যবহার অনেক সময় আমরা তা ধরতে পারি না। যেমন—৮।৯ বছরের ছেলে যদি সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে খেলতে না চায় এবং সব সময়ই বাড়ীতে বসে মায়ের সঙ্গে এবং বছর চারেকের বাচ্চা ভাই-এর সঙ্গে সময় কাটাতে চায় তবে তাকেই অবাঞ্ছিত ব্যবহার বলে মনে করা উচিত। অনেক সময় দেখা যায় যে মা-বাবা পাঁচ বছর বয়সের ছেলের লেখা পড়ায় অমনোযোগ দূর করতে

ব্যস্ত কিন্তু ছেলে যে তখনও আঙ্গুল চোষে এবং এ যে গুরুতর মানসিক অস্বাস্থ্যের লক্ষণ সেইদিকে কোন লক্ষ্য নেই। এই ভাবে নিজেরাই আমরা বিভ্রাটের সৃষ্টি করি।

অনেক মা-বাবা নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির সময় ছেলে-মেয়েদের অনভিপ্রেত ব্যবহারে উৎসাহিত করেন আবার অন্য-সময় একইরূপ ব্যবহারের জন্য তাকে শাসন করেন।

একটি মেয়ে বাড়ীতে এসে ভীষণ বকুনি খেল। তার অপরাধ যে সে পাশের বাড়ী জিজ্ঞাসিত হয়ে বলে এসেছে যে, তার মা বাড়ীর বাইরে যান না কারণ তার ভাইবোন হবে। মা বকে চলেন, "এত বড় ধিঙ্গী মেয়ে অথচ কিচ্ছু যেন বোঝে না—বলতে পারলি না যে মার হার্টের অসুখ হয়েছে তাই ডাক্তার বাইরে যেতে মানা করেছেন।" এই মেয়েকেই মা আর একদিন শাসন করছেন, "খুব মিথ্যে কথা বলতে শিখেছ, কাপটা নিজে ভেঙ্গে আবার অন্যের নামে দোষ দেওয়া হচ্ছে—মেরে একেবারে হাড় গুঁড়ো করে দেব।" আমাদের সুবিধা মত ছেলেমেয়ে কখনও সত্য কখনও মিথ্যে বলবে একি কখনও সম্ভব? বরং তার বুদ্ধি বিবেচনা মত "অনর্থক" বকুনি খাচ্ছে মনে করে মা-বাবার স্নেহে সন্দিহান হবে এবং তার নিরাপত্তাবোধ ক্ষুণ্ণ হবে। বিশেষ করে কৈশোরে যখন ছেলেমেয়ের মনে আদর্শবাদ প্রবল হয়ে উঠে তখন সে এই কারণে মা-বাবার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি হারিয়ে ফেলতে পারে। যে ছেলে মা-বাবার প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছে বা তাঁদের শ্রদ্ধা করতে পারছে না, তার মানসিক স্বাস্থ্যকে বিকৃতি থেকে রক্ষা করা কঠিন।

অনেক সময় মা-বাবা ছেলেমেয়ের ভাল-মন্দের কথা বিচার না করে নিজেদের ভাবাবেগের বশে শাসন করে যান। ধরুন, ছেলে স্কুলে অন্যদের সঙ্গে প্রতিদিনের কাজে তাল রেখে চলতে পারছে না সেদিকে খেয়াল নেই। ত্রৈমাসিক পরীক্ষায় ছেলে ভাল করতে পারল না। পরদিন সকালে ৬টা পর্যন্ত ছেলে ঘুমোচ্ছে দেখে তাকে কান ধরে তুলে কয়েকটা চড়চাপড় লাগিয়ে দিলেন, তার অপরাধ যে সে তখনও পর্যন্ত পড়তে বসে নি। আগের দিন বাবার মনে ছেলে সম্বন্ধে যে বিরক্তি জন্মেছিল তা বেরিয়ে গেল! এর পরে আরও ৩ মাস ছেলের পড়াশুনার দিকে কোন লক্ষ্যই রইল না। সাত বছরের ছেলে যে বুড়ো আঙ্গুল চুষে চলেছে আগে কখনও চোখেও পড়েনি। সেদিন বৈঠকখানায় বাবা তাঁর বন্ধুর সঙ্গে বসে গল্প করছিলেন এমন সময় আঙ্গুল চুষতে চুষতেই ছেলে পান নিয়ে হাজির। বন্ধুর সামনে ভীষণ অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেকে বেশ কিছু মারধোর করলেন। এইরকম ব্যবহারে অবাঞ্ছিত ব্যবহারের তো কোন পরিবর্তন হয়ই না উপরন্তু মা-বাবার হঠাৎ এইরকম শাসন করার তাৎপর্য বুঝতে না পারার জন্য শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়।

কখনও কখনও মা-বাবার মধ্যে শিশুকে শাসন করা নিয়ে মতানৈক্য দেখা দেয়। বাবা হয়তো মেয়েকে প্রশ্রয় দেন এবং মা দেন ছেলেকে। মা যখন মেয়েকে বকেন তখন বাবা তার পক্ষ সমর্থন করেন আবার বাবা যখন ছেলেকে বকেন তখন মা তাকে নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। বাবা যদি বলেন,

"ছোট মেয়ে লোভে পড়ে মিষ্টিটা খেয়ে ফেলেছে—তাতে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে"। মা বাবার মতে মত না দিয়ে একধারে মেয়েকে বকে চলেন। আবার মা যখন ছেলের পক্ষ সমর্থন করে বলেন, "তুমি কেন এত বকাবকি শুরু করেছ? ভুলে পাশের ছেলের পেন্সিলটা ওর ব্যাগে চলে এসেছে—তবু তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না?" তখন মায়ের মতে সায় দেওয়া বাবার সম্ভব হয় না। ফলে মা-বাবার মধ্যে কথা কাটাকাটি আরম্ভ হয়। অনেক সময় মা-বাবার নীতিবোধের জ্ঞানও সমান থাকে না এবং ফলে কোন অবাঞ্ছিত ব্যবহারের গুরুত্ব সম্বন্ধে তাঁদের মধ্যে মতদ্বৈধ দেখা যায়। "এত স্নো পাউডার কেন, স্কুলে যেতে এত রঙিন রঙিন জামারই বা কি প্রয়োজন, এটা ঠিক হচ্ছে না।" বাবা মত প্রকাশ করেন। কিন্তু মা মনে করেন যে দশজনের মধ্যে একজন হয়ে থাকতে হলে এইসবের প্রয়োজন আছে। কারণ যাই হোক না কেন মা-বাবার মধ্যে শিশুকে শাসন করা নিয়ে মতদ্বৈধ হলে তার ফল শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হয়। নিজেদের মতভেদ সম্বন্ধে শিশুর অগোচরে আলোচনা করে একমত হওয়া উচিত। একজনের শাসন করবার সময় অন্যজনের বিপক্ষে দাঁড়ানো উচিত নয়।

শিশুকে শাসন করবার সময় মা-বাবা সাধারণতঃ তার তিনটি ভয়কে কাজে লাগান। এর চাইতে বেশী ক্ষতি শিশুর আর কোন কিছুতেই করতে পারে না। শিশুকে ভর্ৎসনা করা হয়, রক্তচক্ষু করে তার দিকে তাকানো হয়। শিশুর ভয় হয় সে

বুঝি মা-বাবার ভালবাসা হারালো। মা মরে যাবেন বা যেদিকে খুশী চলে যাবেন বলে শিশুকে শাসান। অনেক সময় রেগে গিয়ে শিশুকে একা ঘরে ফেলে চলে যান। পরিত্যক্ত হওয়ার ভয়ে শিশু আতংকিত হয়। রেগে গেলে মা-বাবা অনেক সময় শিশুকে শারীরিক শাস্তিও দিয়ে থাকেন। শিশুর মনে অঙ্গ-হানির ভয় জেগে ওঠে। অনেক মানসিক রোগের কারণ নির্ধারণ করতে গিয়ে দেখা গেছে যে এইরকম কোন না কোন ভয় থেকে এর উৎপত্তি হয়েছে। কাজেই এইভাবে শিশুকে কখনোই শাসন করা উচিত নয়। শিশুকে অবাঞ্ছিত ব্যবহারে লিপ্ত না হওয়ার সুযোগ দিয়ে, যে কারণে সে ব্যবহারের সৃষ্টি হয়েছে তা দূর করবার চেষ্টা করলেই শাসনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

পাঁচ বছরের ছেলে বিছানায় প্রস্রাব করে—যে কোন কারণে তার মানসিক নিরাপত্তাবোধ ক্ষুণ্ণ হয়েছে। রাত্রে সে ভয়ের স্বপ্ন দেখে কেঁদে ওঠে। এই ছেলেকে শাস্তি দিলে ব্যবহারের পরিবর্তন না হয়ে তার মনের জটিলতা আরও বেড়ে যাবে। প্রথমতঃ মা-বাবা দুজনেই তাকে প্রচুর পরিমাণে স্নেহ এবং সঙ্গ দিয়ে তার মনের নিরাপত্তাবোধ বাড়ানোর চেষ্টা করবেন। ভাই-বোনদের সঙ্গে ব্যবহারে বা অন্য যে কোন কারণে তার মনে যদি হীনতাবোধ (Inferiority complex) জেগে থাকে তবে তাও দূর করতে চেষ্টা করতে হবে। মা তাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুমোতে পারেন এবং রাত্রে তাকে আদর করে ডেকে তুলে প্রস্রাব করিয়ে দিতে পারেন। এইভাবে

চললে ধীরে ধীরে ছেলের রাত্রে ভয়ের স্বপ্ন দেখাও বন্ধ হবে আবার বিছানা সিক্ত করার অভ্যাসও দূর হবে।

আত্মবিকাশের প্রচেষ্টা শিশুর অন্যতম প্রধান প্রবণতা। অনুশীলনের দ্বারাই তার শারীরিক ও মানসিক শক্তিগুলি বিকশিত হতে থাকে এবং খেলাই শিশুর পক্ষে একমাত্র অনুশীলনের পথ। খেলায় শিশুকে সাধারণতঃ বাধা দিতে নেই। খেলার সময় বেশী নজর রাখাও (supervision) বাঞ্ছনীয় নয়। শিশুকে সাধ্যমত খেলনা এনে দেওয়া উচিত। তাই বলে দামী খেলনা এনে দিলেই যে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় এমন কোন কথা নেই। বড়দের কাছে কোন খেলনা খুব ভাল বলে মনে হলেও এবং তা খুব দামী হলেও ছেলে তাতে আকৃষ্ট নাও হতে পারে। যে বয়সে শিশুর যে ক্ষমতা বিকশিত হয় তার উপযুক্ত খেলনা সংগ্রহ করে দেওয়াই ভাল। ধরুন, এক বৎসর পর্যন্ত শিশু রং দেখলে আকৃষ্ট হয় এবং হাত দিয়ে সবকিছু চুষতে সে ভালবাসে। তাই রঙিন চুষিকাঠিই তার উপযুক্ত খেলনা। খেলনা যে সবসময় কিনে দিতে হবে এমন কোন কথা নেই। ঘর সংসারের অনেক আসবাবও খেলনার কাজ করতে পারে। কিন্তু খেলনা এমন হওয়া চাই যাতে শিশুর আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকে। শিশুকে খেলায় সঙ্গ দেওয়াও মা-বাবার কর্তব্য। মা-বাবা ছাড়াও, ভাইবোন, অনেক সময় ঠাকুরমা দিদিমা এমন কি ঝি-চাকরও শিশুর পরিবেশের অন্তর্গত। পরিবারের সকলের মধ্যে মধুর সম্পর্ক থাকলে এবং শিশুর সঙ্গে সকলের স্নেহবন্ধন দৃঢ় থাকলে শিশুর মানসিক

বিকাশ স্বাভাবিক পথে অগ্রসর হতে পারে। পরিবারের মধ্যে অশান্তি, ঝগড়া, বিবাদ, ঈর্ষা থাকলে শিশুকেও তা স্পর্শ করে। অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করে যেমন শরীর রোগমুক্ত রাখা কঠিন, তেমনি অশান্তিপূর্ণ পরিবারে বাস করে মনের বিকাশ স্বাভাবিক পথে চালিত করা প্রায় অসম্ভব।

ভয়

৬।৭ বছরের মেয়ে। সেদিন দুপুরে চীৎকার করতে করতে এসে মাকে জড়িয়ে ধরল। কোলে মুখ গুজেও সে ভয়ে থর থর করে কাঁপছে। পাশের ঘরে খেলছিল সে। খেলনার বড় বাক্সটা খুলতেই না কি একটা ভূত তাকে তাড়া করে। ১১ বছরের ছেলে সন্ধ্যা হলেই মায়ের আঁচল না ধরে এ ঘর থেকে ও ঘরে যেতে পারে না। আর একটি ছেলে, ৮।৯ বছর বয়স হোল বাড়ীতে বাইরের লোক কেউ এলে সামনে যেতে চায় না। একা রাস্তায় বেরোয় না—গরু, কুকুর সব কিছুকেই ভয় পায়। ১১।১২ বছরের মেয়ে রাত্রে একা শুতে ভয় পায়। ভয়ের স্বপ্ন দেখে ঘেমে একেবারে নেয়ে ওঠে। তারপর অনেকক্ষণ ঘুমোতে পারে না। ১৪।১৫ বছরের ছেলে, সাপকে তার অহেতুক ভয়। কলকাতায় তিনতলা বাড়ীর উপর যেখানে সেখানে সাপ লুকিয়ে থাকতে পারে এই তার ধারণা। এই ভয় তার এতদূর গড়িয়েছে যে সাপের ছবি দেখলে পর্যন্ত সে ভয় পায়; ছবিতে হাত দিতে ভয়ে আঁৎকে ওঠে।

এইরকম সব ভয় শিশুকে একেবারে অকেজো করে তোলে। মাতাপিতা যে এইসব ভয়ের জন্য কতভাবে বিব্রত হন তা বলে শেষ করা যায় না। অথচ জৈবিক প্রয়োজনেই ভয়ের সৃষ্টি।

আত্মরক্ষার জন্য ভয়ের প্রয়োজন রয়েছে। যেখানে ভয় পাওয়া উচিত সেইখানে যে ভয় পায় না তাকে আমরা দুঃসাহসী বলি এবং এইরকম লোকের জীবনে বিপদ প্রায় অনিবার্য। কিন্তু ভয়ের বাড়াবাড়ি বা অহেতুক ভয়ের সৃষ্টি হলে আমরা তাকে মানসিক রোগের লক্ষণ বলে মনে করি।

শিশুমনের ভয়

অনুসন্ধানে জানা যায় যে, শতকরা নব্বইটি শিশুই কোন না কোন ভয়ে ভীত থাকে। কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ভয় কমতে থাকে। সাধারণতঃ ৩ বছর ৩½ বছরের শিশুদের ভয় থাকে সব চাইতে বেশী। তার পরে ভয় ধীরে ধীরে কমতে থাকে। কিন্তু ৯ বছর বয়স থেকে আবার ভয় বেড়ে চলে এবং কৈশোরে পুনরায় চরমে পৌঁছোয়। কিন্তু এই বৃদ্ধি স্থায়ী হয় না। ১৩।১৪ বছর বয়সের সময় ভয় আবার কমে যায়।

শিশুদের মনে যে কতরকম ভয় থাকতে পারে তা বলে শেষ করা যায় না। অধিকাংশ ভয়ই আবার অদ্ভুত এবং কাল্পনিক। অধিকাংশ শিশুই ভূত, দৈত্য, মৃতদেহ, যাদু প্রভৃতিকে ভয় করে বলে জানা যায়। অনেক সময় এমন ছেলেমেয়েদেরও দেখা যায়, যারা জন্তু জানোয়ারকেই বেশী ভয় করে। পরিত্যক্ত হওয়ার ভয় এবং অপরিচিত মানুষের ভয়ও অনেকের মধ্যে প্রবলভাবে থাকে। অন্ধকার, শারীরিক আঘাত, ভয়ের স্বপ্ন, উঁচু জায়গা, ভূমিকম্প, ডাকাত, ছেলেধরা, দুষ্টলোক, জল—শিশুমনের আরও কয়টি প্রধান ভয়। যা কখনও ঘটবার

সম্ভাবনা নেই তাই কল্পনা করে শিশু একেবারে ভয়ে ম্রিয়মাণ হয়ে থাকে।

আত্মরক্ষাই ভয় সৃষ্টির জৈবিক উদ্দেশ্য। ভয় পেলে আমাদের দেহের অভ্যন্তরে এমন কতকগুলি পরিবর্তন ঘটে যা আমাদের আত্মরক্ষা করার ক্ষমতা অনেকটা বাড়িয়ে দেয়। সাপে তাড়া করেছে—কত তাড়াতাড়ি দৌড়ে যে তার হাত থেকে নিস্তার পেয়েছি স্বাভাবিক অবস্থায় ভাবলে সত্যিই অবাক হতে হয়। কিন্তু অত্যধিক ভয় পেলে মানুষের আত্মরক্ষা করার ক্ষমতাও লোপ পেয়ে যায়। দেখতে পাচ্ছি গাড়ী উপরে এসে উঠে যাচ্ছে তবু ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আবার যেখানে ভয়ের কোন সম্ভাবনা নেই সেইখানে অহেতুক ভয়ের সৃষ্টি হলে তা মানুষকে বিভ্রান্ত করে তুলে। ভয় যেমন স্বাভাবিক, অত্যধিক ভয় বা অহেতুক ভয় তেমনি অস্বাভাবিক।

শেখানো ভয়

শিশুমনের অনেক ভয়ই আমাদের বড়দের শেখানো। তার নিজের অভিজ্ঞতা প্রসূত নয়। ভয় অনেকটা সংক্রামক রোগের মত। পরিবারের বড়রা যা যা ভয় করেন শিশু নিজের অজান্তে তাই ভয় করতে শেখে। বিশেষ করে মা-বাবার সঙ্গে শিশুর সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ যে তাদের মনের ভয় শিশুর মনে আপনা থেকেই সংক্রামিত হয়। শিশু কখনো ভূত বা দৈত্য চোখে দেখে না। এই কাল্পনিক ভয়াবহ জীবগুলি যে কী ধরণের অপকার করতে পারে তা-ও শিশুদের জানা নেই। তবু

বড়দের অনুকরণে তারা এদের ভয় করতে শেখে। সঙ্গীসাথীদের কাছ থেকেও অনেক ভয় তাদের মধ্যে সংক্রামিত হয়। এটা আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতা যে দলের মধ্যে বেশীর ভাগ লোক ভয় পেলে আর বাকী সকলেও ভয় পায়। বন্ধুদের মধ্যে ভয়ের গল্প চলছে। অনেকেরই ভয়ে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে। অনেকটা যেন ভূতুড়ে আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে। দলের মধ্যে যে নিতান্ত সাহসী সেও সাময়িকভাবে কিছুটা প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে। শিশুরা যখন দলে মিশতে আরম্ভ করে তখন সঙ্গীদের সাহচর্য থেকে তাদের মনে অনেক ভয়ের সৃষ্টি হয়। অনেক সময় নিছক আমোদের জন্য বড়রা ছোটদের ভয় দেখিয়ে থাকেন। হয়তো খুব জোরে ধমকে উঠলেন—অমনি ছেলে ঠোট ভেঙে কেঁদে উঠল। সঙ্গে সঙ্গেই আবার আদর করে তাকে শান্ত করা হল। ছেলে যে শাসন এবং আদর কিরকম বুঝতে শিখেছে তা সকলকে দেখিয়ে খুব আমোদ পেলেন বটে, কিন্তু ছেলের মনের নিরাপত্তাবোধ ক্ষুণ্ণ হল। মা-বাবার স্নেহ হারানোর ভয় যে শিশু-মনের একটা বড় ভয় তা আগেই বলা হয়েছে। একবার মনে এই ভয়ের সৃষ্টি হলে আরও দশটা ভয় অনায়াসে মনে দানা বাঁধতে পারে। "তোর মা মরে গেছে" এই বলে মা যদি সত্যি সত্যি মরার ভান করে শুয়ে থাকেন তবে শিশু কেঁদে উঠবেই। ছেলের মনে তাঁকে হারানোর ভয় কতখানি প্রবল তার প্রত্যক্ষ প্রমাণে মায়ের মন হয়তো তৃপ্তি পেল কিন্তু শিশুর মনে ভয় ও উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হল।

অনেক সময় শাসনের উদ্দেশ্যেও বড়রা শিশুদের মনে ভয়

ঢুকিয়ে থাকেন। ছেলে হয়তো কোন কিছুর জন্য বায়না ধরেছে, "ঐ পুলিশ আসছে ধরে নিয়ে যেতে" বলে মা ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগলেন। ছেলে বায়না ভুলে ভয়ের চোটে মায়ের বুকে মুখ লুকালো। ছেলেধরা, ডাকাত, পুলিশ ইত্যাদির ভয় বড়রা এইভাবে ছোটদের মধ্যে সংক্রামিত করে দেন। শেখানো ভয়ও অনেক সময় শিশু-মনে বিপ্লবের সৃষ্টি করে এবং তার স্বাভাবিক বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে। ভয়ের কথা একা একা ভেবে তার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, রাত্রে ঘুমের অসুবিধা হয়, আরও কত কি।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এইসব শেখানো ভয়ের অধিকাংশই আপনা থেকে চলে যায়। কিন্তু কোন কারণে যদি শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের বিকৃতি ঘটে তবে ঐ সব ভয়ই রোগের লক্ষণরূপে প্রকাশ পায় এবং সারা জীবন তাকে পঙ্গু করে রাখে।

ভীতু ছেলে

কোন কোন ছেলেমেয়ে ভীতু প্রকৃতির হয়ে পড়ে। ভীতু ছেলেমেয়েদের মনে সব সময়ই আশংকা, সব কিছুতেই তাদের ভয়। কোন কাজে তারা সাহস করে এগুতে পারে না। সহজভাবে পারিপার্শ্বিকের সম্মুখীন হওয়ার সাহস তাদের নষ্ট হয়ে যায়। ভাতু ছেলেমেয়েরা শরীরের দিকেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুর্বল থাকে। চলার, বসার, তাকাবার ভঙ্গী কেমন যেন স্বাভাবিক নয়। বিনা কারণেই কারও কারও শরীর কাঁপে।

আবার কারও বা নিজের অজ্ঞাতসারেই চোখ কুঞ্চিত ও প্রসারিত হয়। ভীতু ছেলেমেয়েরা স্বেচ্ছায় নিজের দায়িত্বে কোন কাজে এগুতে চায় না। বাড়ীতে মা-বাবার আশ্রয়ে তবু তারা কিছুটা স্বাভাবিক থাকে, কিন্তু অপরিচিত কিছুর সম্মুখীন হলেই তারা অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। এমন কি অনেক সময় ভীতু ছেলেমেয়েরা স্কুলে পর্যন্ত যেতে চায় না। বাড়ীতে অপরিচিত কেউ আসলে তাদের সামনে আসতে চায় না। কাজের দায়িত্ব গ্রহণের ভয়ে অনেক সময় এই ধরণের ছেলেমেয়েদের মধ্যে শারীরিক রোগের লক্ষণও প্রকাশ পায়। যেমন, কোন ছেলে হয়তো স্কুলে যেতে চায় না, কিন্তু মা-বাবার পীড়াপীড়িতে তুদিন স্কুলে গেল কিন্তু তৃতীয় দিন সকালে তার পেটব্যথা আরম্ভ হয়ে গেল। ছেলেটি যে মিথ্যা কথা বলছে তা নয়, তবে স্কুলে যাওয়ার ভয় থেকে এই অসুখের সৃষ্টি।

অনেক সময় মাতাপিতাই ছেলেমেয়েদের ভীতু প্রকৃতি হয়ে জন্মানোর জন্য প্রধানতঃ দায়ী থাকেন। অনেক মাতাপিতা শিশু সম্বন্ধে অতিরিক্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন। "ঐ বুঝি ঠাণ্ডা লাগল, ঐ বুঝি পড়ে গেল"—এই ধরণের উৎকণ্ঠা তাঁদের মনে লেগেই থাকে। প্রায় প্রতি কাজেই শিশু বাধা পায়। কোন কাজই সে স্বাধীনভাবে করতে পায় না। এই ধরণের মা-বাবারা নিজেরা উৎকণ্ঠা রোগে ভোগেন এবং ছেলেমেয়েদের মধ্যেও এই রোগ সংক্রামিত করে দেন। শিশু বড় হতে থাক্‌লেও তাকে প্রায় অসহায় করে রেখে দেওয়া হয়। মুখ ধোয়ানো থেকে জামা কাপড় পরানো সবই মা করে দেন। ছেলে

কিছুই নিজে করতে পারবে না, এই বিশ্বাস। সমবয়সী ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে তাকে খেলতে দিতেও মা-বাবার সাহস হয় না। পাড়ার ছেলেরা তাকে মারবে, নয়ত পড়ে গিয়ে তার হাড় ভেঙ্গে যাবে, এই তাদের আশংকা। সবসময়ই মা-বাবা শিশুকে আগলে রাখেন। কখনও স্বাধীনভাবে পারিপার্শ্বিকের সম্মুখীন হওয়ার সুযোগ তাকে দেওয়া হয় না। কি করে ছেলে মানুষ করবেন এই তাদের এক দুশ্চিন্তা। কখনও কখনও এই নিয়ে মা-বাবার মধ্যে মতভেদও হয় এবং এর ফলে শিশুর মনের আতংক আরও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু হাজার চেষ্টা করলেও কোন মা-বাবাই শিশুকে পারিপার্শ্বিকের আঘাত থেকে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করতে পারেন না। আজ হউক কাল হউক তাকে স্বাধীনভাবে পারিপার্শ্বিকের সম্মুখীন হতে হবে। শিশু বড় হলে মা-বাবা নিজেরাও তা আশা করেন। ভীতু ছেলেকে যখন একা পারিপার্শ্বিকের সম্মুখীন হতে হয় তখন সে একেবারে অসহায় হয়ে পড়ে। আতংকে তার মানসিক ও শারীরিক ক্ষমতা প্রায় লোপ পায়। অতি সহজ কাজেও সে বিফলমনোরথ হয়। ফলে তার ভয় ও আতংক আরও বেড়ে যায়। সে কিছুতেই নিজে থেকে কোন কাজে অগ্রসর হতে চায় না।

স্বচ্ছল মাতাপিতার প্রথম সন্তান হবে। মাতাপিতা দুজনেই শিক্ষিত। ছেলে জন্মাবার আগে থেকেই ছেলের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তাঁদের চিন্তা। প্রতিদিন ডাক্তার দেখছেন আর মা নিত্য নূতন ঔষধ খাচ্ছেন। কিন্তু এত করেও মায়ের স্বাস্থ্য ভাল

যাচ্ছে না। ছেলেটি জন্মালো অত্যন্ত দুর্বল। মায়ের দুধও বেশী পেল না। নানারকম কৌটোবন্দি দুধে ঘর ভরে গেল। কিন্তু কিছুই যেন ছেলের ঠিক সহ্য হয় না। রোগের সঙ্গে লড়াই করে মায়ের আঁচলের অন্তরালে ছেলে বড় হতে লাগল। বুদ্ধিমান ছেলে, মা-বাবার সঙ্গে খেলা, দুষ্টুমি কিছুতেই কমতি নেই। মায়ের চেষ্টায় তিন বছর বয়সেই "হাসিখুশী" অনর্গল আওড়ে যেতে পারে। কিন্তু বাইরের লোক কেউ আসলেই ওর অন্য চেহারা। মায়ের কোল ছেড়ে ছেলে আর নড়তে চায় না। হাজার অনুরোধ উপরোধেও অন্য লোকের সামনে আড়ষ্ট হয়ে থাকবে। মা-বাবা নিরাশ হন। মা ভয় দেখান যে কবিতা না বললে তিনি মরে যাবেন। ছেলে ভয়ে শিউরে ওঠে। মায়ের পিঠের কাছে খুব ঘেঁসে দাঁড়ায়। ৩ বছর বয়সে তাকে পাড়ার একটা নার্সারী স্কুলে দেওয়া হল। কিন্তু স্কুলে গিয়ে মা চোখের আড়াল হলেই ছেলের কান্না আরম্ভ হয়ে যায়। একটা সুবিধা ছিল যে সেই স্কুলে মায়ের মাসী কাজ করতেন। মা স্কুলে গিয়ে অনেকক্ষণ ছেলের সঙ্গে থাকতেন ; তারপরে চুপি চুপি চলে আসতেন। মাসী মায়েরই মতন ছেলের দেখাশুনা করতেন। ধীরে ধীরে স্কুল তার সয়ে গেল। মায়ের কাছে সাহায্য পেত বলে স্কুলে পড়াশুনায় সে ভালই ছিল। তবে সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে সে বেশী খেলা-ধূলো করতে চাইত না। মাসীর সঙ্গে সঙ্গেই সে বেশীর ভাগ ঘুরত। ঐ সময় মাঝে মাঝে সে রাত্রে বিছানায় প্রস্রাব করত।

সাত বছর বয়সে তাকে নূতন স্কুলে ভর্ত্তি করা হল। এবার সে কিছুতেই স্কুলে যেতে চাইত না। মা-বাবা দুজনে মিলে তাকে স্কুলে দিয়ে আসলেন। কিন্তু প্রথম দিন স্কুলে যাবার পর সে তিনদিন জ্বরে ভুগল। মাসখানেক পরে একদিন স্কুলে যাবার জন্য বাসে উঠতে গিয়ে চীৎকার করে পালিয়ে এল। এরপর থেকে আর ছেলেকে বাড়ীর চৌকাঠ পার করানো যায় না। বাড়ীতে সে একা একা খেলা করত এবং মোটামুটি আনন্দেই থাকতো। কিন্তু মাঝে মাঝে হঠাৎ ভয় পেয়ে মায়ের কাছে ছুটে আসতো। তার শরীর ভয়ে থর থর করে কাঁপত আর মাঝে মাঝে সে শিউরে উঠত। শ্বাসও তার খুব ঘন ঘন পড়ত। মা ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরলেই সে ১৫।২০ মিনিটের মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেত। ৫।৬ মাস মা-বাবার কাছে থেকে আদর যত্ন পেয়ে তার অসুখ প্রায় সেরে এল। কিন্তু ভয় তার অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে গেল। একতলা থেকে দোতলায় একা যাওয়ার সাহস তার হোত না। রাত্রে মা ছাড়া শুতেও সে রাজী হত না। বাড়ীতে সে খেলাধূলো করত বটে এবং মাঝে মাঝে পাশের বাড়ী পর্যন্তও যেত, কিন্তু আর কোথাও তাকে পাঠানো যেত না। মা-বাবার সঙ্গে বেড়াতে যেতে আপত্তি করত না, তবে ট্রামে বাসে একদম চড়তে চাইত না। ছেলেটির কেন এমন হোল তা আর বুঝিয়ে বলবার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। মাতাপিতার উৎকণ্ঠা-রোগ থাকলে তা আগে সারানো একান্ত প্রয়োজন। ছেলেকে অতিরিক্ত আগলে না রেখে একথা মনে রাখতে হবে যে তাকে

একদিন স্বাধীনভাবে সংসার-পথে চলতে হবে এবং সেইজন্যই তাকে আমাদের প্রস্তুত করে দিতে হবে। ছেলে যে অক্ষম দুর্বল এইসব ভাব তার অবচেতন মনেও জন্মাতে দেওয়া উচিত নয়।

কোন কোন সময় ঠিক বিপরীত অবস্থায় পড়েও শিশু ভীতু প্রকৃতির হতে পারে। একটি এগারো বছরের রোগা মেয়ে—বড় চঞ্চল, এক মিনিট স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারে না। এটা ফেলছে, ওটা ভাঙ্গছে নয়তো হাতের নখ কামড়ে চলেছে। রাত্রে ভাল ঘুম হয় না তার। অনেক সময় ঘুমের মধ্যেই কেঁদে কেঁদে ওঠে। মধ্যে মধ্যে বিছানা ভিজিয়ে ফেলে। কখনও কখনও বোকার মত হাসে আবার একটুতেই রেগে যায়। একা একাই থাকে, কারও সঙ্গে খেলাধূলাও প্রায় করে না। মরার (মৃতদেহ) ভয় অত্যন্ত প্রবল। রাস্তায় "হরিবোল" শুনলে কোথায় যে লুকোবে তা ভেবে পায় না। একা কোথাও কোন কাজে তাকে পাঠানো যায় না। পড়াশুনায় কিন্তু একেবারে মন্দ নয়। মেয়েটির পাঁচ মাস বয়সেই তার মা মারা গিয়েছিলেন। তারপর দেড় বছর অবধি তাকে ঝিয়ের কাছেই মানুষ হতে হয়। ছোট-বেলায় প্রায়ই অসাবধানতাবশত পড়ে গিয়ে গুরুতর আঘাত পেত। অসুখ বিসুখ তার লেগেই থাকতো। বিকালবেলা পার্কে বেড়াতে নিয়ে গিয়ে একলা ছেড়ে দিয়ে ঝি তার নিজের গল্পগুজবেই মেতে থাকতো। ফলে অনেক সময় বড় বড় ছেলেমেয়েদের কাছে তাকে লাঞ্ছিত হতে হত—ওরা তার খেলনা কেড়ে নিয়ে মারধোর করতো। কিছুদিন পরে বাবা

আবার বিয়ে করলেন এবং তার একটি ভাই জন্মালো। এরপর থেকে তাকে খুব শাসনে থাকতে হোত। ছোট ভাইটিকে ব্যথা দেওয়ার জন্য প্রায়ই তাকে মার খেতে হোত। ছেলেটি অতিরিক্ত আদরে পারিপার্শ্বিকের সম্মুখীন হতে অসহায় বোধ করত এবং মেয়েটির পারিপার্শ্বিকের কাছ থেকে অতিরিক্ত আঘাত পেতে পেতে তার সম্বন্ধে ভীতি জন্মে গিয়েছিল। দুটির কোনটিই মানসিক স্বাস্থ্যের অনুকূল নয়।

হঠাৎ প্রচণ্ড ভয়ের আক্রমণ—১০ বছরের একটি মেয়ে হঠাৎ একদিন স্কুলে যাবার আগে চীৎকার করতে আরম্ভ করে। কোন কারণে সে সাংঘাতিক ভয় পেয়েছে। মাকে জড়িয়ে ধরেও সে কাঁপতে থাকে। মাকে সে কিছুতেই ছাড়বে না। রাত্রে মায়ের কাছে শোয়া সত্ত্বেও প্রায়ই সে জেগে জেগে উঠতে লাগল। পরদিন সে কিছুটা শান্ত হল বটে কিন্তু কিছুতেই স্কুলে গেল না, কিছু খেলও না। বিকেলের দিকে সে আবার আগের দিনের মত চীৎকার করতে লাগলো। এরপর থেকে দিনে তার ৩।৪ বার এইরকম ভয়ের আক্রমণ হতে লাগল এবং প্রতিদিনই এই আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি পেতে লাগল। এইরকম আক্রমণে সাধারণতঃ বমির ভাব বা পেটের ব্যথা লক্ষণ হিসাবে প্রকাশ পায়। মনে হয় শ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছে। কখনও ঠাণ্ডা আবার কখনও গরম অনুভূত হয়। বাড়ীর বাইরে এইরকম আক্রমণ হলে মেয়েটি কোনরকমে বাড়ী ফিরে আসে এবং মা বাবা কাউকে জড়িয়ে ধরে বা ঘরের এককোণে বা বিছানার নীচে লুকিয়ে পড়ে। তারপর ধীরে ধীরে আক্রমণের

লক্ষণ সব প্রকাশ পেতে থাকে। চূড়ান্ত আক্রমণের সময় রোগী মেঝেতে লাথি মারতে, আসবাবপত্র সব ছুঁড়ে ফেলে দিতে এবং দরজায় দড়াম দড়াম করে ধাক্কা মেরে বাড়ী তোলপাড় করে ফেলতে পারে। অনেক সময় রোগী বিনা কারণে কোন তীব্র গন্ধ পাচ্ছে বলে বলতে পারে।

এরকম রোগে মা-বাবার যে বিশেষ কিছু করবার আছে এমন নয়। মানসিক রোগে বিশেষজ্ঞের স্মরণ নিতে হয়। কিন্তু অনেক সময় এইসব রোগের লক্ষণ আপনা থেকেই চলে যায় বা কোন চিকিৎসকের কাছে গেলে তিনি ঘুমের ঔষধ বা বমি বন্ধ হবার ঔষধ দিলেই এই রোগ দূর হয়। রোগ কিন্তু এতে সত্যি সত্যি দূর হয় না। রোগীর মনের অশান্তি থেকেই যায়। পরে যে কোন সময় আবার আরও সাংঘাতিকভাবে এর প্রকাশ হতে পারে। রোগের কারণ যাতে দূর হয় আর রোগীর মানসিক স্বাস্থ্য আবার ফিরে আসে সেই চেষ্টাই মা-বাবার করা উচিত।

মোটামুটিভাবে এইসব রোগের কারণ জানা থাকলে মাতা-পিতা সময়ে সাবধান হতে পারেন এবং আদৌ যাতে এরকম রোগের উৎপত্তি না হয় সেদিকে সচেষ্ট হতে পারেন। এই রকম ক্ষেত্রে শিশুর মধ্যে যে ভয়ের লক্ষণ প্রকাশ পায়, আসলে তা কিন্তু বাইরের কোন ভয় নয়—ইহা শিশুর অন্তরের ভয়ের বহিঃপ্রকাশ। এই সব রোগ প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব না থাকলে হতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে রোগের লক্ষণের সঙ্গেই তীব্র মানসিক দুঃখ ও অনুশোচনা প্রকাশ পায়—মনের মধ্যে অপরাধবোধ খুব প্রবল থাকে। কোন কোন সময় এই সব লক্ষণ ভয়ের লক্ষণের

উপর প্রাধান্য লাভ করে। শিশুর মনে সব সময়ই এ ভাব থাকে যে, যা করা উচিত তা সে করতে পারছে না এবং যেটা অনুচিত ইচ্ছার বিরুদ্ধেও সে তাই করতে প্রবৃত্ত হচ্ছে। যে মেয়েটির কথা আগে দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে, সে আদর্শবাদী মাতাপিতার প্রথম সন্তান। প্রায় জন্ম থেকেই মা-বাবা তাকে সব রকমে আদর্শ করে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। উপযুক্ত বয়সের আগেই (দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য) তাকে বুকের দুধ এবং বিছানায় প্রস্রাব করার অভ্যাস ছাড়ানো হয়েছিল। সামাজিক শিক্ষাও তার খুব অল্প বয়সেই আরম্ভ হয়েছিল। দশজনের সামনে কান্না করা অন্যায়, কিন্তু বাড়ীতে লোক আস্‌লেই আবৃত্তি করে শোনাতে হয় ইত্যাদি শিক্ষার চাপে তার কোন স্বাভাবিক আকাংক্ষারই নিবৃত্তি হতে পারল না। একদিকে তাদের ভালবাসা ছিল যেমন প্রচুর অন্যদিকে শাসন তাদের ছিল তেমনি কঠোর। ৬।৭ বছর বয়স অবধি মন্দ কাটল না। কিন্তু তারপরেই মেয়েটি পড়াশুনায় পিছিয়ে পড়তে লাগল। ইতিমধ্যে মা-বাবার দৃষ্টিও তার উপর অনেকটা কমে গেছে। ৪ বছর বয়সের সময় তার একটি ভাই জন্মেছে। মা তাকে নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। বাবার কাজে উন্নতি হয়েছে, তিনি বাড়ীর দিকে বেশী নজর দিতে পারেন না। ৯ বছর বয়সে সে ক্লাশের দুষ্টু মেয়েদের দলে পড়ে গেল। দুষ্টুমিতে সে এগিয়ে আসতো না বটে তবে সঙ্গে থাকতো। পরীক্ষায় নকল করা, মিথ্যে কথা বলা, অশ্লীল কথা নিয়ে আলোচনা করা, সবকিছুতেই এই দলের মেয়েরা অভ্যস্ত ছিল। মেয়েটির সব দিক থেকে

অবনতি হতে থাকলেও ভাল হওয়ার আকাংক্ষা কিন্তু তার মন থেকে কমে গেল না। ছোট ভাইটির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে মা-বাবার ভালবাসা পাওয়ার আকাংক্ষা আরও বেড়ে গেল। অথচ তার পরীক্ষার ফল, ব্যবহার প্রভৃতি তার এই আকাংক্ষার প্রতিকূল হয়ে দাঁড়ালো। ১০ বছর বয়সে তার মানসিক দ্বন্দ্ব চরমে পৌঁছল। এর মধ্যে তাদের দলের একটি মেয়ে চুরি করার ফলে কঠিন শাস্তি পেল। প্রধান শিক্ষিকা বললেন যে তাদের দলের প্রত্যেকটি মেয়ের দুষ্টুমির কথা তিনি তাদের অভিভাবকদের জানিয়ে দেবেন। এর এক সপ্তাহের মধ্যেই মেয়েটির প্রচণ্ড ভয়ের আক্রমণ দেখা দিল। এই ভয় তার মনেরই অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রতীক। সে দুষ্টু মেয়েদের সঙ্গে মিশতে চায় না, কিন্তু তার ভয় যে সে তার নিজের ইচ্ছা সত্ত্বেও তাদের দল ছাড়তে পারবে না। তার মনে আদর্শবাদ খুব প্রবল, কিন্তু তার ভয় যে সে আদর্শানুরূপ চলতে পারছে না। এর মধ্যে তার মনে প্রচণ্ড আঘাত দিল তার দুষ্টুমির কথা মা-বাবার কাছে প্রকাশ হয়ে যাওয়ার আশংকা। তার ভয় হল যে সে এবার মা-বাবার ভালবাসা সম্পূর্ণরূপে হারাবে।

প্রথম প্রথম মা-বাবা মেয়েটির প্রতি খুব দৃষ্টি দিলেন—তার মনে আদর্শবোধ ও উচ্চাকাংক্ষা প্রবল ভাবে জাগিয়ে দিলেন। তার ব্যবহার এমন করে তুললেন যে সে সবার কাছে প্রশংসা পেতে লাগল। ৪ বছর বয়স থেকে সে আর মা-বাবার সাহায্য পেল না, ব্যবহারের উঁচু মান আর তার পক্ষে রাখা সম্ভব হল না। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিযোগিতাও বেড়ে গেল, বাড়ীতে

ভাই-এর সঙ্গে—ক্লাশে ৪০টি মেয়ের সঙ্গে। অবস্থা বিবেচনায় মা বাবা যদি মেয়ের সম্বন্ধে প্রত্যাশা কমিয়ে দিতেন তবু একরকম চলতো। কিন্তু তবু তারা আশা করে থাকলেন মেয়ে ক্লাশে প্রথমই হবে। স্বাভাবিক পথে আত্মতৃপ্তি না হওয়াতে মেয়েটি বিনিময় ব্যবহার (substitute satisfaction) হিসাবে অসৎ কাজে লিপ্ত হল। মাতা পিতা ভুল না করলে মেয়েটির এ রোগের সৃষ্টি হোত না।

ব্যাপারটা স্পষ্টভাবে বোঝবার জন্য আর একটা সহজ দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে। একটি ৫ বছরের ছেলে হঠাৎ একদিন রাত্রে চীৎকার করে কেঁদে উঠে মাকে জড়িয়ে ধরল। হঠাৎ প্রচণ্ড ভয়ের আক্রমণের আরও অনেক লক্ষণ তার মধ্যে প্রকাশ পেল। এর-পর মধ্যে মধ্যে এরকম হতে লাগল। অনুসন্ধানে জানা গেল যে ৩।৪ দিন আগে ছেলেটির আত্মরমণের চেষ্টা মায়ের চোখে ধরা পড়ে। তিনি তাকে জাগিয়ে দিয়ে কঠোর শাসন করেন এবং এইরকম আর করলে পুলিশ এসে তার পুরুষাঙ্গ কেটে দেবে বলে ভয় দেখালেন। এর পর থেকে ঘুমুলেই ছেলেটির ভয়ের আক্রমণ হতে লাগল। নিরুপায় হয়ে মা ছেলেকে বললেন আত্মরমণ করলে তিনি আর তাকে কিছু বলবেন না। এরপর ছেলে স্বাভাবিক ভাবেই ঘুমাতে লাগল। কিন্তু বেশীদিন মা ছেলের, আত্মরমণ সহ্য করতে পারলেন না তিনি তাকে আবার শাসালেন। ফলে আবার রাত্রের ভয় দেখা দিল।

আত্মরমণ সকল শিশুর পক্ষেই স্বাভাবিক ব্যবহার। না

জেনে মা ছেলেকে ভয় দেখালেন—মনোবীক্ষণকারীরা বলেন যে, স্ত্রী-বা-পুরুষ-অঙ্গ নষ্ট হওয়ার ভয় সকল শিশুরই অন্যতম প্রধান ভয়! না জেনে মা ছেলের প্রবলতম ভয়ে আঘাত করলেন। ফলে শিশুর মনে ভয় জাগল যে ঘুমালেই সে হয়তো অজান্তে আত্মরমণে লিপ্ত হবে এবং পুলিশ-হস্তে তাকে তার পুরুষাঙ্গ হারাতে হবে।

অযৌক্তিক ভয়—১৪।১৫ বছর বয়সের মেয়ে। একখানা ছবি নিয়ে ১০ বছরের ছোটভাই তাকে এ ঘর থেকে ও ঘরে তাড়া করে চলেছে। ছবিখানার দিকে সে তাকাতে পর্যন্ত পারছে না। চীৎকার করে সে এ ঘর থেকে ও ঘরে পালাচ্ছে। শেষে নিরুপায় হয়ে মায়ের পেছনে এসে আশ্রয় নিল। ছেলেটি একটি সাপের ছবির সাহায্যে মেয়েটিকে ভয় দেখাচ্ছিল। মেয়েটি ভাল করেই জানে যে তার ভয় অযৌক্তিক, তবু সে ভয় না পেয়ে থাকতে পারছে না।

এইরকম ধরণের কুকুর, ঘোড়া, মৃতদেহ, ইঁদুর, বেড়াল, বন্দুক প্রভৃতি কত কিছুর ভয় ছেলেমেয়েদের এমন কি বড়দেরও থাকে। ইংরেজিতে একে "ফোবিয়া" বলে। "ফোবিয়া" মানুষকে অনেকখানি পঙ্গু করে দেয়। "ফোবিয়া" গুরুতর মানসিক রোগের লক্ষণ। সময়ে সাবধান না হলে পরে এর থেকে গুরুতর মানসিক রোগ দেখা দিতে পারে।

একটি ৮ বছরের মেয়ের ঘোড়ার সম্বন্ধে অযৌক্তিক ভয় ছিল। রাত্রে ঘোড়াটা জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে বলে মনে হোত। ঘোড়াটি সাপের মত ঘাড় বেঁকিয়ে জানালার

শিকের মধ্য দিয়ে নাক ঢুকিয়ে দিচ্ছে ভেবে মেয়েটি ভয়ে কাঠ হয়ে চীৎকার করতেও ভুলে যেত। মেয়েটি ভীষণ ভয় পেয়ে আপাদমস্তক চাদর ঢাকা দিয়ে শুয়ে থাকতে থাকতে কখন ঘুমিয়ে পড়ত। দিনের বেলাও সে শোবার ঘরে যেতে ভয় পেত। তার এই ভয় যে অবিশ্বাস্য তা সে জানতো বলে আর কারও কাছে সে তা প্রকাশ করতে পারতো না।

একটি ১০ বছরের ছেলের রেলগাড়ীর ইঞ্জিনের ভীষণ ভয় ছিল। ইঞ্জিনের শব্দ শুনলে সে ভয়ে কোথায় লুকুবে ভেবে পেত না। মেয়েটির ভয় ছেলেটির মত সম্পূর্ণ কাল্পনিক ছিল না। ইঞ্জিনকে ছোট ছেলেদের ভয় করাটা কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়, কিন্তু উল্লিখিত ছেলেটির ভয়টা একটু বেশী হয়ে গিয়েছিল। দুজনেরই ভয় মনের আতংকগ্রস্ত অবস্থা থেকে সৃষ্ট। তবু মেয়েটির থেকে ছেলেটির মানসিক স্বাস্থ্যের জটিলতা অপেক্ষাকৃত কম কারণ ছেলেটির ভয়ের ভিত্তি তবুও কিছুটা বাস্তব।

ফোবিয়া এবং অভিজ্ঞতা প্রসূত ভয়ে কিন্তু তফাত আছে। যেমন, কোন ছেলেকে কুকুরে কামড়াল—কুকুর দেখলেই তার ভয় পাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এইরকম ভয় বেশীদিন স্থায়ী হয় না। সব কুকুরই যে কামড়ায় না, তা সে কিছুদিন পরেই বুঝে ফেলে। কুকুর সম্বন্ধে মনের আতংকও ধীরে ধীরে চলে যায়।

ভীতু ছেলেমেয়েদের মধ্যে ফোবিয়া অল্পবিস্তর সবারই থাকে। তাদের মনের অবস্থা যত জটিল হতে থাকে ততই ফোবিয়া প্রাধান্য লাভ করতে থাকে। অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকেই এইসব ভয়ের সৃষ্টি। প্রকৃত ভয় রোগীর মনে—নিজের সম্বন্ধে। কোন

কারণে সে নিজেকে তার আদর্শের অনুপযুক্ত বলে বিবেচনা করছে। তার মনে হীনতাবোধ ও অপরাধবোধও প্রবল থাকে। সবসময়ই হয়তো নিজের আশা আকাংক্ষা অন্যায় ভেবে নিজেকে দাবিয়ে রাখতে হয়। যে মেয়েটি সাপের ছবি দেখে পালাচ্ছিল সেই মেয়েটির মনে যৌন-সম্ভোগ সম্বন্ধে ছোটবেলা থেকেই একটা মন্দ ধারণা জন্মিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যে দিন তার প্রথম ঋতু হল, সেদিন আবার এক কাণ্ড ঘটল। দুটি সাপকে জড়াজড়ি করে তাদের উঠানে পড়ে থাকতে দেখা গেল। তার মা বললেন এই দিনে ঐ রকম দেখা নাকি ভাল। সাপ-সাপিনীর মধ্যে তখন যৌন-খেলা চলছিল। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যখনই মেয়েটির মনে যৌন-সম্ভোগের আকাংক্ষা জাগ্‌ত তখনই গুরুতর পাপ করছে বলে ভীত হত। ঐ ভয় কি করে অবচেতন মনে সাপের সঙ্গে জড়িয়ে গেল তা বলা শক্ত। ফলে সে সাপের ছবি দেখ্‌লেই ভয় পেতে লাগ্‌ল। যাদের মনে অযৌক্তিক ভয়ের সৃষ্টি হয়েছে তাদের বিশেষজ্ঞ দ্বারা চিকিৎসা করান দরকার। অবহেলিত হলে পরে এর থেকে গুরুতর মানসিক রোগে আক্রান্ত হওয়া অসম্ভব নয়।

সব সময় উৎকণ্ঠা বোধ :

অনেক ছেলেমেয়ের মানসিক উৎকণ্ঠা প্রায় রোগে পরিণত হয়ে যায়। সব সময়ই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশংকা—কি হবে! যে আশংকার বাস্তবে কোন ভিত্তি নাই, তাই কল্পনা করে ভয়ে প্রায় শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে! পড়্‌ছে, হঠাৎ মনে হল বাবা

যে অফিসে গেছেন আর যদি না ফিরেন ; বাইরের দরজাটা যদি ভুলে বন্ধ করা হয়ে না থাকে, চোর এসে যদি পাশের ঘরের সব জিনিসপত্র নিয়ে গিয়ে থাকে ! আর পড়া হল না। ভয়ে গা কাঁটা দিয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। একবার গিয়ে দেখে এলো বাইরের দরজা বন্ধ আছে কিনা ! জানে যে আশংকার কোন সঙ্গত কারণ নেই, তবু আশংকা মন থেকে দূর করতে পারে না। উদ্ভট উদ্ভট আশংকার কল্পনা, সব সময়ই মন জুড়ে আছে, অনেকের আবার সব সময়ই মন আশংকায় ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে। কেন তা ঠিক্ বোঝে না। বুক'টা ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করে। একটু সময়ের জন্যও শান্তি নাই। সব সময়ই চঞ্চল। কিছুতেই মন বসাতে পারে না। রেলগাড়ীতে বা বাসে উঠ্‌লে গা বমি বমি করা, রাত্রে ঘুমালে ঘেমে নেয়ে উঠা, ভয়ের স্বপ্ন দেখা ইত্যাদি লক্ষণ উৎকণ্ঠা রোগগ্রস্ত ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রকাশ পেতে পারে। যে সব ছেলেমেয়েরা উৎকণ্ঠা রোগে ভোগে, সামান্য কিছুতেই তারা ভীষণ ভাবে চম্‌কে উঠে, আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ে। হয়ত পর মুহূর্তে নিজের ব্যবহারের জন্য লজ্জিতও হয়।

একটি সাত বছরের ছেলে, প্রতিদিন ঘুমানোর সময় বিনা কারণে কাঁদতে সুরু করত। কেন কাঁদ্‌ছে নিজেও কিছু বল্‌তে পারতো না। অনুসন্ধানে জানা গেল যে সে উৎকণ্ঠা রোগে ভুগ্‌ছে। কিছুদিন থেকেই তার রাত্রে ভাল ঘুম হত না—মধ্যে মধ্যে বিছানায় প্রস্রাবও করত। অসুখের দোহাই দিয়ে বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে খেলতে যাওয়াও সে বন্ধ করে দিয়েছিল।

ছেলেটিকে যখন বিশেষজ্ঞের কাছে আনা হল, তখন তার চোখে মুখে উৎকণ্ঠার ছাপ—তার অসুখ হয়েছে ভেবে সে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। অসুখ হওয়াকে সে ভীষণ ভয় পেত। কিছু-ক্ষণের মধ্যেই কিন্তু সে তার মনের অনেক ভয়ের কথাই বিশেষজ্ঞের কাছে বলে ফেল্‌ল। অন্ধকার তার ভীষণ ভয় করে, রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখবে এই তার আতংক, তার মনে নিশ্চিত ধারণা কেউ এসে তাকে মা-বাবার কাছ থেকে দূরে নিয়ে যাবে আর তাকে একা থাক্‌তে হবে।

বুদ্ধিমান কল্পনাপ্রবণ ছেলেমেয়েরাই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে উৎকণ্ঠা রোগে আক্রান্ত হয়। জন্মগত শক্তিগুলি যখন প্রকাশের সুযোগের অভাবে, মনের মধ্যেই আবদ্ধ করে রাখ্‌তে হয়, তখনই মনে উৎকণ্ঠাজনিত ভয়ের সৃষ্টি হয়। খুব শিশুকাল থেকেই এসব ছেলেমেয়েরা নানা দিকে কর্মচাঞ্চল্য দেখায়—এক মুহূর্তও তারা শান্ত হয়ে থাক্‌তে পারে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাতাপিতা এবং পরিবারের অন্যান্য বয়স্ক লোকেরা নানারূপ বাধা নিষেধের দ্বারা ছেলেমেয়েদের আত্মপ্রকাশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেন। যে ছেলেমেয়েরা বেশী বাধা নিষেধে, নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে বড় হয়ে ওঠে, তাদের মনে উৎকণ্ঠা রোগের সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা। প্রকাশের সুযোগের অভাবে মানসিক শক্তিগুলি, মনের মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে অশান্তির সৃষ্টি করে এবং সব কিছুই স্বাভাবিক থেকে অনেক বড় হয়ে তাদের কাছে ধরা পড়ে। ফলে যে সব ভয় সব ছেলেমেয়েরই অল্প বিস্তর থাকে, তাই এদের মনে সাংঘাতিক আতংকের সৃষ্টি করে।

ভয়ের বিষয়-বস্তুগুলিও নিতান্ত সাধারণ এবং মামুলি থাকে, যেমন, অন্ধকার, বাতাস, আগুন, জল, জন্তুজানোয়ার, শব্দ, রোগ, মৃত্যু, কুৎসিত বা পঙ্গু লোক, অপরিচিত লোক, নূতন যায়গা ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে, ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত আত্মপ্রকাশের সুযোগ দিলে, বিশেষ করে পড়াশুনার উন্নতিতে সাহায্য করলে, এবং বাধানিষেধ কমিয়ে দিয়ে অনেকটা স্বাধীন ভাবে চলতে দিলে, রোগ দূর হয়ে যাওয়া সম্ভব।

অনেক সময় হীনতাবোধও ঐ রকম উৎকণ্ঠার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে পড়ে। যে কাজে যাচ্ছে, সে কাজে নানা রকম উদ্ভট উদ্ভট কারণে বিফল হওয়ার আশংকা তার মনে জাগে। একটি মেয়ে স্কুল ফাইনেল পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে গাড়ীতে করে—তার মনে ভয়, কখন গাড়ী রাস্তায় বিকল হয়ে যাবে আর সে সময়-মত পৌঁছোতে পারবে না। চিড়িয়াখানা দেখ্‌তে ঢুকেছে ৪টার সময়, জানে যে গেট্ বন্ধ হবে ৬টার সময়, তবু আশংকা যে অর্ধেক দেখবার আগেই গেট্ বন্ধ হয়ে যাবে। সে কোন কিছুই ভাল করে দেখ্‌তে পারছে না, সঙ্গের সকলকে শুধু তাড়া দিচ্ছে। সকাল বেলা পড়তে বসেছে, কিন্তু ভয়, স্কুলের না দেরী হয়ে যায়। আশংকার দরুণই পড়ায় মন বসাতে পারছে না। এরকম ক্ষেত্রে মন থেকে হীনতাবোধ দূর করার চেষ্টা করতে হয়।

অনেক সময়, মা-বাবার কাছ থেকে উৎকণ্ঠা রোগ সন্তানে সংক্রামিত হয়। মা-বাবারা নিজেরা ঐ রোগের হাত থেকে মুক্ত না হলে, সন্তানের গুরুতর ক্ষতি হওয়া সম্ভব।

মা-বাবার কর্তব্য

ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভয় যাতে রোগে পরিণত না হয়, সে বিষয়ে মা-বাবার সর্বদা সজাগ থাকা প্রয়োজন। মনে দাগ কাটে এইরকম ভয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিশুকালেই সৃষ্টি হয় এবং তাতে মা-বাবার দায়িত্ব খুব বেশী। উপরের আলোচনায় ছেলে-মেয়েদের মনের বিভিন্ন ধরণের ভয় এবং তাদের উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এখন এ সম্বন্ধে মা-বাবার কর্তব্য-সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

মা-বাবার সর্বপ্রথম নিজেদের মনের ভয় ও আতংক সম্বন্ধে কিছুটা অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন আছে। শিশুকালে মা-বাবার মনের ভয় ও আতংক অজ্ঞাতসারে সন্তানের মনে সঞ্চালিত হয়। যে ছেলে স্কুলে যেতে চায় না—স্কুলে যাওয়ার সময় পেট কামড়ায়, তার মায়ের মনে হয়তো ছেলেকে স্কুলে পাঠানো নিয়ে দুশ্চিন্তা আছে। তাঁর মনের দুশ্চিন্তা শিশুমনে সঞ্চালিত হয়ে পেট কামড়ানোয় প্রকাশ পায় (অবশ্য শিক্ষকের শাসনের ভয়ে বা অন্য কারণেও এমন ঘটতে পারে)।

অনেক সময় মা-বাবা যে সব ভয় ও আতংক রোগে ভোগেন, সন্তানের মধ্যেও সেইসব রোগ প্রকাশ পায়। নিছক মা-বাবার অনুকরণে শিশু এইসব ভয়ে ভীত হয়। মায়ের মনে ভূতের ভয় থাকলে শিশুর মনে সেই ভয় সঞ্চালিত হওয়া আশ্চর্য নয়। আবার মা-বাবার মনের ভয় ও আতংক অনেক ক্ষেত্রেই সন্তানকে ঘিরে প্রকাশিত হয়। অনেকে ত সন্তানকে নিয়ে রীতিমত বাতিকগ্রস্ত হয়ে পড়েন। ছেলের কি হবে এই এক দুশ্চিন্তা।

শরীর ভাল থাকছে তো? পড়াশুনায় ভাল হওয়া চাই যে। স্বভাব চরিত্র যদি খারাপ হয় তবেই তো সর্বনাশ। তাদের নিজেদের মানসিক অসুস্থতা সন্তানকেও রোগগ্রস্ত করে তোলে।

শিশুমনের প্রধান প্রয়োজন-বোধগুলির নিবৃত্তির দিকেও বিশেষ দৃষ্টি না দিলে ছেলে উৎকণ্ঠাগ্রস্ত হতে পারে। এই বিষয়ে প্রথম পরিচ্ছেদে বিশদ ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ধরুন "বাপন্"-কে ফেলে আমরা যে রকম মেয়েদের নাচ দেখতে গিয়েছিলাম, এই রকম যদি আরও বার কয়েক করতাম তবে বাপনের মনে যে আতংক রোগের সৃষ্টি হত তাতে সন্দেহ নেই। বাইরের লোকের কাছে যাওয়া সে ত বন্ধ করে ছিলই। তারপর হয়ত দেখতাম একটু শব্দেই সে চম্‌কে উঠে আশ্রয় খোঁজে, একটু নূতন ধরনের খেলনা ধরতে ভয় পায় ইত্যাদি। কারণ শিশু-জীবনের যা সব চাইতে বড় প্রয়োজন, সেই নিরাপত্তাবোধ বাপনের ব্যাহত হয়েছিল। শিশুমনে ক্ষমতার অতিরিক্ত আশা আকাংক্ষা জাগিয়ে তুললেও ভয় রোগ জন্মানোর সম্ভাবনা থাকে—সব সময়ই তাকে প্রাণান্ত চেষ্টা করেও বিফলমনোরথ হতে হয়। অবাস্তব আদর্শ বোধও অনেক সময় শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। ধরুন যৌন-আকাংক্ষা সম্বন্ধে পূর্বে উল্লিখিত মেয়ের মনে যে অবাস্তব ধারণা জন্মিয়ে দেওয়া হয়েছিল তার ফলে তার মনে সাপ সম্বন্ধে বাতিকের সৃষ্টি হয়ে পড়ল। পদে পদে যে শিশুকে মনের আশা আকাংক্ষার বিরুদ্ধে চলতে হয়, তার মনে আতংকের সৃষ্টি হওয়া কিছুই আশ্চর্য নয়। পারিপার্শ্বিকের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক আদর্শের সম্ভাব্যতা এবং

অসম্ভাব্যতা বিবেচনা করা প্রয়োজন এবং শিশুর মনে যাতে অতিরিক্ত অপরাধবোধের সৃষ্টি না হয় সে বিষয়ে অবহিত হওয়া দরকার।

আগেই বলা হয়েছে, মা-বাবা অনেক সময় শাসনের উদ্দেশ্যে মিথ্যা ভয় দেখিয়ে, শিশু-মনে অহেতুক ভয়ের সৃষ্টি করেন। এ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান থাকা প্রয়োজন। এই রকম ভাবে সৃষ্ট অনেক ভয় পরে বাতিকে পরিণত হতে দেখা গিয়েছে। আমাদের বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতিতে উৎকণ্ঠা রোগ বিশেষ প্রবল হয়ে পড়েছে। অনেকের জীবনেই তা বিশেষ ক্ষতি করছে। এই রোগ সম্বন্ধে আমাদের সাধ্যমত সাবধান হওয়া প্রয়োজন।

জেনেশুনে প্রবঞ্চনার উদ্দেশ্যে অসত্য কথা বললে তাকে মিথ্যা কথা বলে। বর্তমানে মিথ্যা কথা আমাদের সমাজে প্রায় সর্বত্রই চালু হয়ে পড়েছে। সামান্য কারণেই আমরা মিথ্যা কথার আশ্রয় নিয়ে থাকি। মিথ্যা কথা বলার জন্য কোন সামাজিক ঘৃণাও আমাদের সইতে হয় না। মিথ্যা কথার বিরুদ্ধে নীতিবোধ আমাদের প্রায় চলে গেছে বললেই হয়। মিথ্যা কথা বলতে আজকাল আমাদের বিন্দুমাত্রও দ্বিধাবোধ থাকে না, প্রবঞ্চনায় সফল হব কিনা তাই শুধু সমস্যা।

মিথ্যা কথা ও মিথ্যা ব্যবহার একই পর্যায়ে পড়ে। উভয়েরই মূল উদ্দেশ্য প্রবঞ্চনার দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধি। যে ছেলে মিথ্যা কথায় অভ্যস্ত, সুযোগ পেলে পরীক্ষায় নকল করতে সে ছেলের দ্বিধাবোধ হয় না। মিথ্যা কথা বলা যার অভ্যাস কালো-বাজারে অর্থ-উপার্জন করতে তার নীতিবোধ জাগ্রত হওয়ার বিন্দুমাত্র কারণ নেই। সমগ্র চরিত্রই অসত্য এবং বঞ্চনার ভিত্তিতে গঠিত হলে মানুষ মিথ্যা কথায় রপ্ত হয়ে ওঠে।

সামাজিক সম্বন্ধের পক্ষে মিথ্যা কথা কিন্তু গুরুতর ক্ষতিকর। পরস্পরের অবিশ্বাসের ভিত্তিতে কোন সামাজিক সম্বন্ধ গড়ে উঠতে পারে না। পরস্পর অবিশ্বাসের দরুণ সহযোগিরূপে একত্র

হয়ে কোন কাজে ব্রতী হওয়া দিনদিনই আমাদের সমাজে কঠিন হয়ে পড়ছে। সমবায় বা কো-অপারেটিভ (co-operative) আন্দোলনের মাধ্যমে আমাদের সমাজের অনেক সমস্যার সমাধান হবে বলে আমাদের আশা। সরকারও সর্বরকম চেষ্টা করছেন সমবায় আন্দোলন গড়ে তুলতে। কিন্তু আমাদের মিথ্যা কথা এবং মিথ্যা ব্যবহারের অভ্যাসের দরুণ এই আন্দোলন আশানুরূপ ভাবে গড়ে উঠ্‌তে পারছে না। মিথ্যা সন্দেহের ফলে অনেক সময় আমাদের পরস্পরের মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি হচ্ছে এবং অনেক অনভিপ্রেত ব্যবহার দেখা দিচ্ছে। একটু স্পষ্ট করে বোঝাবার জন্যে দুটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাচ্ছে। চাকুরীতে নিয়োগের ব্যাপারে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সভ্যরা সত্য সত্য নিরপেক্ষ থাকতে পারেন তা আমরা করতে পারি না এবং নানা নীতিবিরুদ্ধ উপায়ে হয়ত তাদের প্রসাদ লাভের চেষ্টা করি। বাসের কণ্ডাক্টার নূতন পয়সায় মানুষ ঠকিয়ে কিছু পয়সা পকেটে ঢোকাচ্ছে এই ধারণা থেকে তার সঙ্গে ঝগড়া সুরু করি। মিথ্যা কথা এবং অসত্য ব্যবহার আমাদের সমাজের গুরুতর পাপ। যতই আমাদের আশা আকাংক্ষা বেড়ে যাচ্ছে এবং তাদের নিবৃত্তির পথে বাধা পড়ছে, প্রবঞ্চনার অভ্যাস ততই আমাদের বেড়ে যাচ্ছে। সমাজকে এ পাপের হাত থেকে উদ্ধার করতে না পারলে আমাদের সকল উন্নতির আশা অলীক স্বপ্নে পরিণত হবে। সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত না হলে সে সমাজে বাস করে কেউ শান্তি, তৃপ্তি পেতে পারে না।

মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস ছেলেমেয়েদের পক্ষে গুরুতর ক্ষতিকর। যে শিশু প্রবঞ্চনার মাধ্যমে উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা করে, তার আত্মোন্নতির চেষ্টা চলে গেছে বলেই ধরে নিতে হবে। তার শক্তি দোষ-সংশোধনের চেষ্টায় ব্যয়িত না হয়ে দোষ গোপনের চেষ্টায় ব্যয়িত হয়। দোষ গোপন করার প্রবৃত্তির জন্য মাতাপিতা বা শিক্ষকের পক্ষে ঐরূপ শিশুকে উপযুক্ত সময়ে দোষ সংশোধনে সাহায্য করাও সম্ভব হয় না। মাতাপিতা এবং শিক্ষকের সঙ্গে মিথ্যাবাদী ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধ সরল এবং মধুর থাকাও সম্ভব নয়। এক পক্ষে বঞ্চনা ধরা এবং অন্য পক্ষে বঞ্চনা করা প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। এই অবস্থায় পরস্পরের সম্বন্ধ তিক্ত হয়ে উঠতে বাধ্য। মাতাপিতা এবং শিক্ষকের প্রতি শিশুর মনে বিরুদ্ধ ভাব সৃষ্টি হওয়ার জন্য তাঁদের পক্ষে শিশুকে কোনরূপ শিক্ষা দেওয়াই সম্ভব হয় না। উপদেশ সাধারণতঃ উল্টো ফল দিয়ে থাকে। এক কথায়, যে ছেলে মিথ্যা কথায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে তার ঐ অভ্যাস দূর না করে তাকে "মানুষ" করা প্রায় অসম্ভব।

কল্পনাজনিত মিথ্যা কথা

নানা কারণে শিশুরা মিথ্যা কথা বলে থাকে। অল্প বয়সে অনেক সময় নিজেদের কল্পনা ও সত্যের মধ্যে প্রভেদ ধরতে না পেরে শিশুরা "মিথ্যা কথা" ব'লতে পারে। পাঁচ বছরের মেয়ে দোলন্। মায়ের কাছে গল্প করছে, "জান মা, কাল রাত্রে আমার ঘরে লক্ষ্মীঠাকরুণ এসেছিলেন—কত আদর করলেন

আমায়, কত খেতে দিলেন। দেখ না তাঁর দেওয়া মিষ্টি এখনও রয়ে গেছে। তোমাদের তিনি মিষ্টি দিতে বলেছেন"। আসল ব্যাপার, বাবা অফিস ফেরৎ মেয়ের জন্য মিষ্টি এনেছিলেন। মেয়ের চোখে তখন ঘুম জড়িয়ে আছে। বাবার কাছ থেকে মিষ্টিগুলি নিয়েই সে ঘুমিয়ে পড়ে। তারপর রাত্রে স্বপ্ন। ঘুম থেকে উঠে স্বপ্ন ও বাস্তবের প্রভেদ সে বুঝতে পারে না। নিজেরই অজান্তে সত্যের সঙ্গে কিছু কল্পনাও মিশে যায়।

আর একটি ৪ বছরের ছেলে। ৩।৪ দিন হতে চল্‌ল রাত্রে ঘুমাতে গেলেই সে ভয় পায়। কখনও কখনও মাকে জড়িয়ে ধরে "ভূত", "ভূত" বলে চীৎকার করে। ভূত নাকি তাকে ধরতে আসে—তার বিছানায় ব'সে সে নাকি তাকে ভীষণ ভয় দেখায়। অনুসন্ধানে জানা গেল যে বাবার একটা কালো কোট দেওয়ালের এক কোণে—ঘরে টাঙানো থাকত। চাঁদের আলোয় কোটটার ছায়া ছেলেটির কাছে ভূতের মত মনে হত। বাকিটুকু ছেলের কল্পনা। এইরকম মিথ্যা কথা নিয়ে মা-বাবার চিন্তিত হওয়ার কারণ নেই। বয়স হলে শিশু আপনা থেকেই কল্পনা আর বাস্তবের মধ্যে প্রভেদ ধরতে পারে। এবং এই রকম "মিথ্যা কথা" তার ব্যবহার থেকে ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকে।

কিন্তু কল্পনা যখন খুব উদ্ভট হয়ে পড়ে বাস্তবে যখন তার কোন ভিত্তিই থাকে না, মা-বাবাকে তখন মানসিক রোগের আশংকা করে সময়ে সাবধান হতে হয়। ৬।৭ বছরের ছেলে বাপ্পা। কেউ বাড়ীতে এলেই, সে যে গায়ের জোরে পাড়ার

সব ছেলেকেই হারিয়ে দিতে পারে, তা গল্প করা চাই। তার দাদা দিদি কেউ তার সঙ্গে জোরে পারে না। এই সম্বন্ধে বানিয়ে বানিয়ে অনেক গল্প করে যায়। এর থেকে বুঝতে হবে যে হয় ছেলেটির মনে হীনতা বোধ জন্মেছে, নয় সে ভাইবোনেদের সম্বন্ধে ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়েছে। ছেলেটির মনে কোনও না কোন রকম মানসিক দ্বন্দ্ব চল্‌ছে।

খেলার ছলে মিথ্যা কথা

অনেক সময় শিশুরা খেলার ছলে মিথ্যা কথা বলে থাকে। বিশেষ করে বড়দের সঙ্গে এই রকম খেলায় তারা বেশী আনন্দ পেয়ে থাকে। "বাবা, বাঘ আসছে!" খোকন বাবাকে ভয় দেখায়। বাবা ভয়ে কোথায় লুকুবেন ঠিক করতে না পেরে লেপ দিয়ে মুখ ঢাকেন। তার পর দুজনেই হাসতে থাকেন। একে ঠিক মিথ্যা কথা বলা যেতে পারে না। দুপক্ষই একে মিথ্যা বলে জানেন এবং এরকম খেলার মধ্য দিয়ে আমোদ পান। এইরকম খেলা শিশুকে তার মনের অনেক ভাব প্রকাশের সুযোগ দিয়ে তার মনের স্থৈর্য আনে—শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে এইরকম খেলা অপকার না করে উপকারই করে থাকে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এইরকম খেলা আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যায়।

শাস্তি এড়ানোর জন্য মিথ্যা কথা

সাধারণতঃ ছেলেমেয়েরা শাস্তির ভয়ে মিথ্যা কথা বলে

থাকে। মাতাপিতা এবং শিক্ষকের কাছে শিশুরা সাধারণতঃ প্রশংসাই পেতে চায়। শিশুদের বিচার করার বেলায় তাঁরা আবার অত্যন্ত কঠোর। মাতাপিতা চান সন্তানকে নিজের চাইতেও বিদ্বান, বুদ্ধিমান, কৃতি দেখতে। শিশু যখন মাতাপিতার আকাংক্ষা পূরণে নিজেকে অক্ষম বোধ করে তখন অনেক সময় সে মিথ্যা কথার আশ্রয় নেয়। একটি ষষ্ঠ শ্রেণীর ছেলে, মা-বাবা জিজ্ঞেস করলে সবসময়ই বলে যে সে ক্লাসে খুব ভাল করেই পড়া বলতে পারে। প্রথম পরীক্ষা দিয়ে এসেও বলল যে সে খুব ভাল করেছে। পরীক্ষার ফল যখন বের হল তখন কিন্তু দেখা গেল যে ছেলেটি ফেল করেছে। ক্লাস V অবধি সে অন্য স্কুলে পড়ত। ফল মোটামুটি ভালই করত। তবু সে মা-বাবাকে সন্তুষ্ট করতে পারত না। নতুন স্কুলের পড়াশুনার মান অনেক উঁচু ছিল। সেখানে সে সুবিধা করে উঠতে পারছিল না। মা-বাবার বকুনির ভয়ে সে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিল—সত্য বলতে তার সাহস হচ্ছিল না। শাসন কঠোরতর হলে ছেলেমেয়েদের মিথ্যা কথায় অভ্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনা আরও বেশী থাকে। "চিঠিখানা ডাক বাক্সে ফেলেছিস্ তো?" বাবার প্রশ্নের উত্তরে ছেলে 'হ্যাঁ' বলে ঘাড় নাড়ল। সত্যি সত্যি সে কিন্তু চিঠিটা ফেলতে ভুলে গেছে। কিন্তু বাবা বড় কড়া—মার খাওয়ার ভয়ে সে মিথ্যা কথা বলতে বাধ্য হল। এখানে মিথ্যা কথাটার গুরুত্ব তেমন কিছু নয় কিন্তু যত সামান্যই হউক, একবার মিথ্যা কথা বলতে আরম্ভ করলে খুব তাড়াতাড়িই সেটা চরিত্রের অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়।

যে সব পরিস্থিতিতে ছেলেমেয়ে আশা আকাংক্ষা পূরণে পদে পদে বাধা পায়, সে সব পরিস্থিতিতে তারা সহজেই মিথ্যা কথা বলায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। গল্পের বই পড়তে নিষেধ, পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মিশতে বারণ, সিনেমায় যেতে মানা। ছেলে আর আত্মপীড়ন করতে পারে না। লুকিয়ে লুকিয়ে সে গল্পের বই পড়ছে, কাজে বেরিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে এক ঘণ্টা আড্ডা দিয়ে ফিরছে, পয়সা চুরি করে স্কুল পালিয়ে সিনেমা দেখছে। ধরা পড়লে মিথ্যা কথা বলে শাস্তির হাত থেকে রক্ষা পেতে চেষ্টা করে। যে ছেলে এরকম মিথ্যা কথা বলতে অভ্যস্ত হয় সে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারছে না বলে বুঝতে হবে। শাসনের দ্বারা বা বক্তৃতার দ্বারা মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস দূর করা সম্ভব নয়। পারিপার্শ্বিককে সহজতর করে দিয়ে আত্মোন্নতির চেষ্টায় সাহায্য করলে, শাস্তি এড়ানোর জন্য মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস ধীরে ধীরে চলে যায়। যে ছেলে স্কুলের পড়া নিয়ে মিথ্যা কথা বলছে, মা-বাবা যদি তার পড়াশুনার উন্নতি সম্বন্ধে তাদের আশা আকাংক্ষা কমিয়ে এনে কিছুটা বাস্তবধর্মী করে নেন এবং ছেলেকে শুধু শাসন না করে পড়ায় উন্নতি করতে সাহায্য করেন তবে পড়াশুনা নিয়ে ছেলের আর মিথ্যা কথা বলার প্রয়োজন হয় না।

মানসিক রোগের লক্ষণরূপে মিথ্যা কথা

অনেক সময় কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হলেও অনেকটা যেন মিথ্যা কথা বলার জন্যই ছেলেমেয়েরা মিথ্যা কথা বলে থাকে।

তাঁরা নিজেরাও বোঝে যে তাদের কথা অন্যরা কেউ বিশ্বাস করছে না এবং মিথ্যা কথা বলার জন্য আরও দশজনের কাছে তারা খেলো হয়ে যাচ্ছে বুঝেও অনেকটা যেন বাধ্যতামূলক ভাবেই তারা মিথ্যা কথা বলে চলে। অনেকেই হয়ত এ রকম ছেলেমেয়ে দেখে থাকবেন যারা সর্বদাই মিথ্যে বড়াই করে থাকে। একটি ১৪।১৫ বছরের ছেলে বন্ধুদের কাছে গল্প করে চলছিল—কাল কি করে হঠাৎ টালিগঞ্জে বম্বের এক বিখ্যাত ছায়াচিত্র অভিনেত্রীকে গাড়ী চড়ে যেতে দেখেছিল এবং সেই অভিনেত্রী তাকে দেখতে পেয়ে এক হোটেলে নিয়ে গিয়ে বিরাট ভোজ দিয়েছিলেন, ইত্যাদি। শুনে বন্ধুদের সকলেই প্রায় মুচকি মুচকি হাসছিল কারণ সেই ছেলেটির স্বভাব তাদের প্রায় সকলেরই জানা। দু'একটি নতুন ছেলে অবাক হয়ে মন দিয়ে শুনছিল। একটি ছেলে বলেই বসল, "যা যা আর গুল ঝাড়তে হবে না।"…বিলাত থেকে উড়ে এসেছিল তোকে গাড়ী করে হাওয়া খাওয়ানোর জন্য" (সেই দিনই কাগজে ঐ অভিনেত্রীর বিলাত যাত্রার সংবাদ বেরিয়েছিল)। ছেলেটি কিন্তু একটুও অপ্রস্তুত না হয়ে নিজের কথার সত্যতার উপরই জোর দিয়ে বলল—"রেখে দে তোর পচা কাগজের খবর। যা হয়েছে তাই বলছি।" অনেকে আবার নিজের সম্বন্ধে বড়াই না করে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সম্বন্ধে মিথ্যে বড়াই করে থাকে—ওর বাবা কি দাদা কবে কোন্ গৌরবান্বিত কাজ করেছিলেন তারই বর্ণনা। একই গল্প হয়তো বার বার করে চলেছে। এরকম ছেলেমেয়ে মিথ্যা কথার মাধ্যমে নিজের মনের হীনতাবোধের কাছ থেকে রেহাই

পেতে চেষ্টা করে। ফলে সে যে মিথ্যাবাদী একথা ধরিয়ে দিলে তার রোগ না কমে বরং বেড়ে যাওয়ারই সম্ভাবনা থাকে। শাস্তি বা বকুনিতে কোন ফলই হয় না। কোনও না কোনরূপে তার জীবনে সার্থকতা এনে দিতে না পারলে এরকম মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস দূর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। যত তার মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস বেড়ে চলে ততই সে অকেজো হয়ে পড়ে—শুধু মিথ্যা গল্প করে বেড়ায়—কোন কিছুতে মন বসে না—বাস্তব জগত থেকে ক্রমেই সে দূরে চলে যেতে থাকে। এই রোগের প্রতিকার—ছেলের আশা-আকাংক্ষাকে নিজের সাধ্যের মধ্যে নিয়ে আসতে চেষ্টা করে, তার অক্ষমতার সমালোচনা না করে যে দিকে সম্ভব সেই দিকেই তাকে সফলতা অর্জ্জনে সাহায্য করা।

কখনও কখনও মানসিক অশান্তির দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে ছেলে-মেয়েরা মিথ্যা কথা বলতে পারে। একটি ১০ বছরের ছেলে—মা-বাবা খুবই শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত। কিন্তু তাদের মধ্যে সব সময়ই ঝগড়া-বিবাদ এবং মনোমালিন্য লেগে থাকে। ফলে একমাত্র ছেলে হলেও, ছেলেটি মাতাপিতার তেমন আদর পেত না। অধিকন্তু মা-বাবার মধ্যে মনোমালিন্য শিশু-মনে গুরুতর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করত। ক্রমাগত মানসিক অশান্তির ফলে একটা যে কোন কাজ করার তাড়নায়, সে ক্লাসে ছোট-খাট চুরি করতে আরম্ভ করে। চুরিতে সে সহজেই ধরা পড়ে যেত; কিন্তু একেবারে হাতে-নাতে ধরা পড়া সত্ত্বেও সে কখনও অপরাধ স্বীকার করত না—সব সময়ই মিথ্যা কথা বলত। তার কথা বিশ্বাসযোগ্য কি না সেদিকে তার কোন খেয়ালই থাকতো না।

পাশের ছেলেটির কলম তার পকেটে পাওয়া গেল। তার উত্তর হল—কখন যে পাশের ছেলেটি তার পকেটে কলমা পূরে দিয়েছে সে ঠিক খেয়াল করে নি। ছেলের মনের শান্তি ফিরিয়ে এনে তাকে প্রকৃতিস্থ করে দিতে পারলে, এ সব ব্যবহার আপনা থেকেই চলে যায়।

ছেলেমেয়েদের মধ্যে মিথ্যা কথা দূর করতে হলে মা-বাবার নিম্নলিখিত বিষয়ে দৃষ্টি রাখতে হবে।

কখনও কোন কারণে তাদের নিজেদের মিথ্যা কথা বলা চল্‌বে না। অনেক সময় মা-বাবা মিথ্যা কথার সাহায্যে ছেলে-মেয়েদের বায়না এড়াতে চান। খেতে বসে মেয়ে হয়ত অম্বল খাওয়ার জন্য কান্না জুড়েছে, মা অম্লানবদনে অম্বল রান্নাই হয়নি বলে তাকে ফাঁকি দিতে চেষ্টা করলেন। বাজারে গিয়ে ছেলে হয়ত একটা দামী খেলনা কিন্‌তে বায়না ধরেছে, বাবা তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে ভুল করে পয়সার ব্যাগটা ফেলে এসেছেন, আর একদিন কিনে দেবেন। ছেলেমেয়েদের কোন কাজ থেকে নিবৃত্ত .করার জন্যে বা কোন কাজে তাদের প্রবৃত্ত করার জন্যেও অনেক সময় মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া হয়। মা ছেলেকে সাবধান করে দিচ্ছেন, "দেখ বাবা, এতে (বাড়ীর রেডিও) কিন্তু হাত দিও না, কাম্‌ড়ে দেবে।" মেয়ে দুধ খেতে চাইছে না, বাবা মিথ্যা প্রলোভন দেখালেন যে, দুধটুকু খেয়ে নিলেই তিনি খুকীকে নিয়ে বেড়াতে বেরুবেন। মা হয়ত ভয়ই দেখালেন, দুধ না খেলে পেটে "সাপ" হয়। সাময়িক ভাবে এসব মিথ্যা কথায় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলেও, ধীরে ধীরে ছেলেমেয়েরা

সত্য বুঝতে পারে এবং পরে মিথ্যা কথায় আর ফল হয় না। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যে মিথ্যা কথা বলা চলে এ জ্ঞানও তাদের জন্মে যায়। ছেলে সত্য মিথ্যার প্রভেদ ধর্‌তে পারে, তার বুদ্ধি পাকা হচ্ছে ভেবে অনেক মাতাপিতা গর্ব বোধ করেন এবং বাড়ীতে লোক এলে তাদের সাম্‌নে ছেলের যে এ ক্ষমতা জন্মেছে তা দেখাতে চেষ্টা করেন—তাঁরা মিথ্যা কথা বলে ছেলেকে ফাঁকি দিতে চেষ্টা করেন, আর ছেলে সঙ্গে সঙ্গেই তা ধরে ফেলে! এর ফলে ভবিষ্যৎ জীবনে যে ছেলের মিথ্যা কথা বলার অভ্যাসের গোড়া পত্তন হল তা একবার ভেবেও দেখেন না। সাধ্যবহির্ভূত বা অসঙ্গত কোন কিছুর জন্য বায়না ধরে শিশু কান্না ধরলে মাতাপিতার তা সহ্য করতে কষ্ট হয় বটে, কিন্তু কিছুক্ষণ ধরে কাদলে শিশুর তাতে কোন ক্ষতি হয় না। শিশুর কান্না থামানোর জন্য মিথ্যা কথার আশ্রয় নেওয়া কিছুতেই উচিৎ নয়। মাতা-পিতা যথাসাধ্য শিশুর ইচ্ছা পূরণের চেষ্টা করবেন, কিন্তু যেখানে তা সম্ভব নয় সেখানে তা স্পষ্ট করে বলে, দৃঢ় ব্যবহার করলে শিশুদের বায়না ধরা কমে যায়। ছোট হলেও, শিশুরা যে যুক্তি একেবারে বোঝে না, তা নয়। ছেলেমেয়েদের খাওয়ায় অনিচ্ছা নানা কারণে জন্মায়। মিথ্যা ভয় বা প্রলোভনের সাহায্যে তা দূর করার চেষ্টা বেশী দিন কার্যকরী হয় না। এক কথায় ছেলেমেয়েদের ব্যবহার পরিবর্তনের চেষ্টায় মা-বাবার মিথ্যার আশ্রয় সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা প্রয়োজন।

মা-বাবা অনেক সময় নিজেরাই ছেলেমেয়েদের মিথ্যা কথা শেখান। স্কুলে, নয় বছরের ছেলের বয়স সাত বছর লিখিয়ে,

ছেলেকে শিখিয়ে দিলেন, মাষ্টার মশায় জিজ্ঞেস করলে সে যেন সাত বছরই বলে। সন্তান-সম্ভবা মা মেয়েকে সাবধান করে দিলেন, কেউ জিজ্ঞেস করলে সে যেন বলে মায়ের অসুখ করেছে, কি অসুখ করেছে তা সে জানে না। বাস থেকে নেমে ছেলে বাবাকে জিজ্ঞেস করলে, "টিকিট কিনলে না যে বাবা!" বাবা উত্তর করলেন, "দূর বোকা, চাইলে না যখন টিকিট কিনতে যাব কেন।" এমনি কত ভাবে আমরা ছেলেমেয়েকে মিথ্যা কথা ও মিথ্যা ব্যবহার শেখাচ্ছি। ছেলেমেয়েদের সত্যবাদী করতে হলে, মা-বাবাকে সত্যবাদী হতে হবে সকলের আগে। কোন কারণে মিথ্যার আশ্রয় নিলে এবং তা ছেলেমেয়ের চোখে ধরা পড়লে, মা-বাবাকে স্পষ্ট করে নিজের ত্রুটি এবং দুর্বলতা স্বীকার করতে হবে এবং ছেলেমেয়েরা তাঁদের চাইতে ভাল হবে এবং তারা সব সময় সত্য কথা বলবে এ আশা তাঁরা করেন এটা বুঝিয়ে দিতে হবে।

কঠোর শাসনের ফলে, অনেক সময় আমরা ছেলেমেয়েদের মিথ্যা কথা বলায় অভ্যস্ত করে তুলি। ত্রুটি-বিচ্যুতি সকলের জীবনেই আছে। ছেলেমেয়েরা ভুল করবে এতে আশ্চর্য কি! ভুল করলে, অন্যায় করলেই তাদের যদি কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়, তা হলে আত্মরক্ষার জন্য তারা মিথ্যার আশ্রয় নিতে চেষ্টা করবে, এতে আর আশ্চর্য কি! ছেলেমেয়েদের শাসনের নীতি আমাদের পরিবর্তন করতে হবে। অন্যায় করার চাইতে তা গোপন করার চেষ্টা অধিকতর গ্লানিকর, একথা মেনে নিতে হবে। অন্যায় করে ছেলেমেয়েরা যদি মা-বাবার কাছে দোষ

স্বীকার করে, তবে তাদের ভবিষ্যতে সংশোধনের সম্ভাবনা থাকে। তাই শাসন করতে হলে, অন্যায় অপেক্ষা, অন্যায় গোপন করার চেষ্টার জন্য বেশী শাস্তি দিতে হয়। অন্যায় করে, তা স্বীকার করে ভবিষ্যতে সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দিলে, শাস্তি না দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

ছেলেমেয়েদের স্বাভাবিক আশা আকাংক্ষাকে মেনে না নিলে তাদের পূরণের জন্য অনেক সময় ছেলেমেয়েরা মিথ্যা কথা ও মিথ্যা ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়। যে বাড়ীতে খুব কঠোর আইন কানুনের মধ্যে ছেলেমেয়েদের মানুষ হতে হয়, সে বাড়ীর ছেলেমেয়েদের মিথ্যায় অভ্যস্ত হওয়া আশ্চর্য নয়। বাড়িতে হয়ত ছোটদের গল্পের বই পড়া একেবারে নিষেধ। মেয়ে, বন্ধুর কাছ থেকে বই ধার করে এনে গোপনে পড়তে চেষ্টা করলে, আশ্চর্য হওয়ার কিছু নাই। সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতিতেই যে সব মা-বাবার ধৈর্যচ্যুতি হয়, তাঁদের ছেলেমেয়েদের মিথ্যা কথায় অভ্যস্ত হওয়ার আশংকা থাকে। বাবা সকালবেলা ছেলেকে কয়খানা চিঠি ডাক বাক্সে ফেল্‌তে দিয়েছিলেন। কিন্তু চিঠিগুলি ভুলে ছেলের পকেটেই রয়ে গেছে। বিকালে জিজ্ঞাসিত হয়ে ছেলে চিঠি ফেলেছে বলে মিথ্যা কথা বলে দিল, কারণ জানে যে সত্য কথা বল্‌লে অনেক বকুনি শুন্‌তে হবে, এমন কি দু'একটি চড় চাপড় খাওয়াও আশ্চর্য নয়। সম্ভব হলে, ছেলেমেয়েদের ব্যবহার পরিবর্তনের জন্য শাসন ও পুরস্কারের আশ্রয় একেবারে না নেওয়াই ভাল।

হীনতাবোধ বা মানষিক অশান্তি থেকে ছেলেমেয়েরা মিথ্যা কথা বল্‌তে প্ররোচিত হতে পারে, এ আলোচনা আগেই করা হয়েছে। কাজেই মা-বাবাকে পারিবারিক শান্তি রক্ষার জন্য বিশেষ দৃঢ় হতে হবে। মাতাপিতা দু'জনের মধ্যে যাতে সম্বন্ধ মধুর হয় সে চেষ্টা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। ভাই, বোন এবং পরিবারের অন্যান্য যাঁরা আছেন, সকলের মধ্যেই প্রীতির সম্বন্ধ থাকবে। ছেলেমেয়েরা সকলের ভালবাসা নিয়ে শান্তির আবহাওয়ায় বড় হতে থাকবে। তা হলে মানসিক অসুস্থতার জন্য মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস জন্মাবার সম্ভাবনা থাকবে না।

ছেলেমেয়েদের মধ্যে যাতে হীনতাবোধ জন্মাতে না পারে সে দিকে সর্বাগ্রে দৃষ্টি দিতে হবে। মাতা পিতা ছেলেমেয়েদের নিজস্ব যোগ্যতা ও প্রবণতাকে স্বীকার করে নিলে এই সম্ভাবনা অনেকখানি কমে যায়।

যে ছেলের প্রথম হওয়ার সম্ভাবনা নাই, দু'জন, তিনজন মাষ্টার রেখে দিয়ে, তাকে সারাক্ষণ পড়ায় বসিয়ে রাখলে উদ্দেশ্য সিদ্ধির সম্ভাবনা ত নাইই, বরং তার মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশংকা প্রচুর। আমাদের বড়দের মনের দুরাশা, শিশুদের মনে ঢুকিয়ে দিয়ে, তা পূরণের জন্য তাদের তাড়া দিয়ে চললে মনের হীনতাবোধ ঢাকবার জন্য তারা মিথ্যা কথা বলতে আরম্ভ করতে পারে। তাদের অক্ষমতার জন্য মা-বাবার স্নেহ হারাবার আশংকায়ও তারা মিথ্যা কথা বলতে পারে। ছেলেমেয়েদের স্বাভাবিক আত্মবিকাশের উপযুক্ত

সুযোগ করে দেওয়া মাতাপিতার কর্তব্য। কিন্তু, তার পর যে শিশু যে ভাবে গড়ে উঠে (কেউবা পড়ায় ভাল হয়, কেউবা গানে প্রতিভা দেখায়, কেউ আবার কোন কিছুতেই মাঝারির উপর উঠতে পারে না, ইত্যাদি) মা-বাবার তাই স্বীকার করে নেওয়া উচিৎ। মা-বাবাকে এ কথা সব সময় মনে রাখতে হবে যে ছেলেমেয়ে তাদের সুবিধামত মিথ্যা কথা বা সত্য কথা বল্‌বে সে কখনও হতে পারে না। ছেলে যদি স্কুলে নিজের বয়স সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বল্‌তে গ্লানিবোধ না করে, তবে, প্রয়োজন বোধে বাবার কাছে মিথ্যা কথা বল্‌তেও পশ্চাৎপদ হবে না। এক কথায়, ছেলেমেয়েদের সত্যবাদী করে তোলায় মা-বাবার দায়িত্ব অনেক বেশী।

—(०)—